গ্রহপরিচয়



বিমান বসু

[illegible]

গ্রহ পরিচয়

বিমান বসু

ছোটদের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
রবীন বল
৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ : বিমান বসু
নামাঙ্কন : সঞ্জয় দে

শিশুবর্ষে গৃহীত পরিকল্পনায়
প্রকাশিত ৯০তম গ্রন্থ

মূল্য : ১৫৲

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৮৪
নতুন মুদ্রণ 1989

অশোককুমার চৌধুরী
দীপ্তি প্রিন্টিং ওয়ার্কস
পি-২১, সাহিত্যপরিষদ স্ট্রীট
কলকাতা-৬

ভূমিকা

গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে মানুষের কৌতুহল বহু প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। আকাশে তারাদের মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত গ্রহদের চলাফেরা মানুষকে বরাবর আকৃষ্ট করেছে। পরবর্তী কালে দূরবীনের আবিষ্কারের পর সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির বিষয় অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি। কিছু গত দু'দশকের মহাকাশ অভিযানের ফলে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা যে কোনও রহস্য উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। অথচ এ বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় কিশোর পাঠকদের জন্য খুব অল্পই লেখা হয়েছে। যে ক'টা বই চোখে পড়েছে সেগুলিতে যথেষ্ট আধুনিক তথ্য নেই বললেই চলে। এ অভাবটা পূর্ণ করার ইচ্ছে অনেক দিন থেকেই ছিল। সুযোগ মিলে গেল অপ্রত্যাশিত ভাবে। শ্রীসমরজিত কর এবং শ্ররবীন বলের অনুপ্রেরণায় লিখতে শুরু করলাম 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'এ। এই বই সেই রচনাগুলিরই সংকলন। বইটা যদি পাঠকের ভাল লাগে তাহলেই আমার চেষ্টা সার্থক মনে করবো।

বিমান বসু

নতুন দিল্লী
31 জানুয়ারি, 1984।

এ বই তুলে দিলাম আমার অসংখ্য
ছোট ছোট ভাইবোনদের হাতে
যাদের অদম্য কৌতুহল এবং উৎসাহই
আমায় অনুপ্রাণিত করেছে।

এ বই এ কি কি আছে

গ্রন্থে ব্যবহৃত চিত্রগুলি ইউ এস আই এস এর সৌজন্যে প্রাপ্ত


বুধ
শুক্র
পৃথিবী
মঙ্গল
বৃহস্পতি
শনি
ইউরেনাস
নেপচুন
প্লুটো

সৌরমণ্ডল পরিচয়

রাত্তিরের আকাশে যদি চাঁদ না থাকে তবে কেমন দেখায় তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। কালো কুচকুচে আকাশে দেখতে পাওয়া যায় অসংখ্য তারার মেলা। শহরের ধোঁয়াটে আকাশে অবশ্য অত তারা দেখতে পাওয়া কঠিন। তবে গ্রামাঞ্চলের স্বচ্ছ পরিবেশে রাতের আকাশ দেখে মনে হয় যেন হাজার হাজার হীরে বসানো গালচে।

সেই অসংখ্য তারার সবকটির ঔজ্জ্বল্য কিন্তু একরকম নয়। তাদের কোনটা খুব বেশী উজ্জ্বল আবার কোনটার আলো এত ক্ষীণ যে শুধু চোখে প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। একটু লক্ষ্য করলে আরো একটা জিনিস চোখে পড়ে। তা হলো আকাশের নানা জায়গায় গুটিকয়েক উজ্জ্বল তারা নিয়ে তৈরী নানারকম নক্সা। তাদের কোনটাকে দেখে মনে হয় জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত, কোনটা বা হাতে তীর ধনুক ধরা ব্যাধের মত, কোনটা দেখে মনে হয় যেন একটা সিংহ বসে আছে, আবার কোনটা দেখতে প্রকাণ্ড এক বিছের মত।

আকাশের ঐ সব কাল্পনিক নক্সাকেই আমরা বিভিন্ন রাশি বলে জানি। এই সব রাশিগুলির বিশেষত্ব হলো এই যে, বছরের পর বছর ধরেও এদের আকারে কোনও পরিবর্তন হয় না। মানে, সপ্তর্ষিমণ্ডলে বা কালপুরুষ রাশিতে যে সব তারা যে সব জায়গায় আজ দেখা যাচ্ছে, আজ থেকে বহু বছর পরেও তাদের ঠিক সেই সব জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যাবে।

কখনও কখনও রাতের আকাশে কিছু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেখতে পাওয়া যায় যেগুলি শুধু চোখে অবিকল তারার মত দেখায়। কিন্তু কিছুদিন লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে সেগুলি তারার মত স্থির নয়। বরং ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করছে। এই চলমান জ্যোতিষ্কগুলিই হল গ্রহ। রাতের আকাশে এদের অস্বাভাবিক আচরণ আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগেও মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। আর এই বিভিন্ন আচরণের ভিত্তিতেই আধুনিক দূরবীন আবিষ্কারেরও বহুকাল আগে পাঁচটি গ্রহের পৃথক গতির বিষয় মানুষ জানতে পেরেছিল। তবে এ ছাড়া গ্রহ সম্বন্ধে আর বেশী কিছুই তখন জানা ছিল না। সে সব জানতে পারা গিয়েছিল আরও অনেক পরে।

গ্রহ সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু বলার আগে এসো দেখা যাক গ্রহ কি, আর তারা বা নক্ষত্রের সঙ্গে এর পার্থক্য কি। শুধু চোখে দেখতে প্রায় এক রকম লাগলেও বস্তুতঃ গ্রহ এবং নক্ষত্র সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। নক্ষত্র হলো বিশাল গ্যাসীয় পিণ্ড যার উত্তাপ কয়েক হাজার ডিগ্রী। সে তুলনায় গ্রহের আকার খুবই ছোট এবং তাপমান মাত্রা কয়েক শ' ডিগ্রী। আমাদের সূর্য একটি মাঝারি সাইজের নক্ষত্র যার মূল উপাদান হলো হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ম গ্যাস। এর ব্যাস হলো প্রায় 14 লক্ষ কিলোমিটার। সে তুলনায় সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির ব্যাস হলো মাত্র 14 হাজার কিলোমিটার, মানে সূর্যের ব্যাসের মাত্র এক শতাংশ।

আয়তনের পার্থক্য ছাড়াও পৃথিবী থেকে গ্রহ এবং সূর্য বাদে যে কোনও নক্ষত্রের দূরত্বেও প্রচুর প্রভেদ আছে। পৃথিবী থেকে সৌরমণ্ডলের বাইরে নিকটতম নক্ষত্র হলো প্রক্সিমা সেণ্টরি (Proxima Centauri) যার দূরত্ব পৃথিবী থেকে 41 লক্ষ কোটি (মানে 41-এর পরে বারোটা শূন্য) কিলোমিটারেরও বেশী। সে তুলনায় সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটোর দূরত্ব পৃথিবী থেকে মাত্র 600 কোটি কিলোমিটার।

গ্রহ এবং নক্ষত্রের মধ্যে আরও একটি বিশেষ পার্থক্য হলো এদের বিকিরণের বেলায়। নক্ষত্র নিজেই দীপ্তিমান, কিন্তু গ্রহের নিজস্ব কোনও আলো নেই, সে দীপ্তিমান সূর্যের প্রতিফলিত আলোয়। সেজন্য নক্ষত্রের আলো স্পন্দনশীল কিন্তু গ্রহের আলো স্থির।

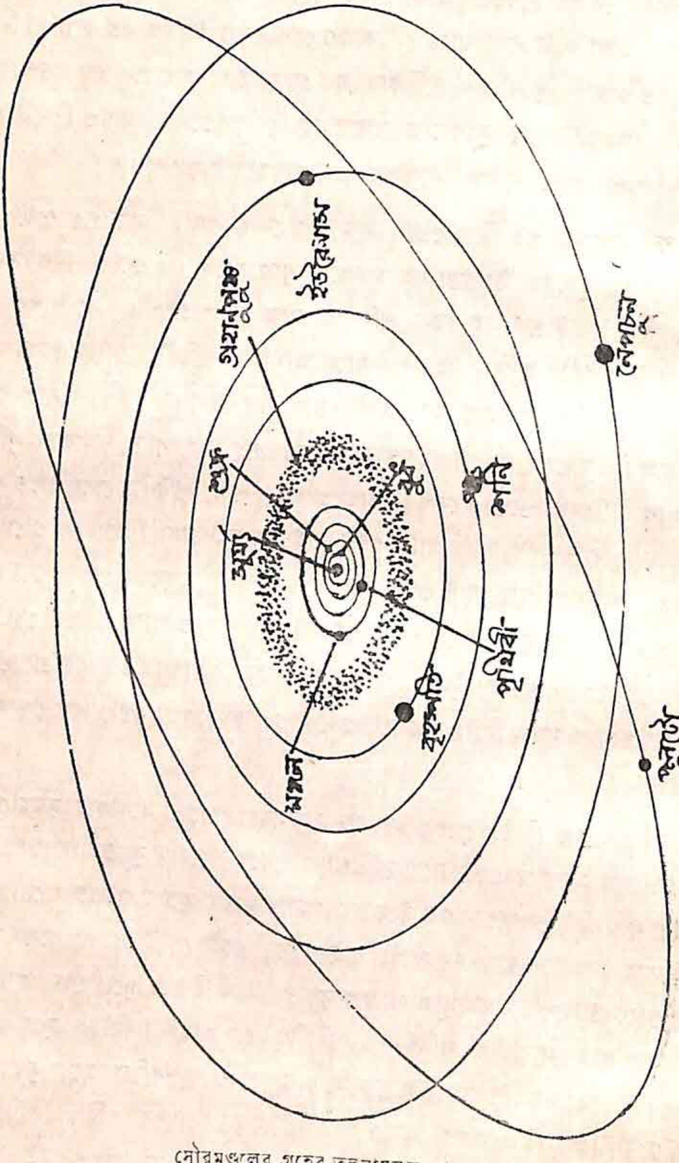
বহু বছরের পর্যবেক্ষণের পর আজ থেকে 450 বছর আগে মানুষ প্রথম জানতে পারলো যে পৃথিবীসহ সবকটি গ্রহই সূর্যকে বিভিন্ন দূরত্বে প্রদক্ষিণ করছে (সে সময় অবশ্য পৃথিবী ছাড়া মাত্র পাঁচটি গ্রহের কথাই জানা ছিল)। এটাও জানতে পারা গেল যে বিভিন্ন কক্ষপথে গ্রহের পরিক্রমণের গতি ভিন্ন ভিন্ন। আর সেজন্যই রাতের আকাশে তাদের গতিপথ জটিল মনে হয়। কোপারনিকাস (Copernicus) টাইকোব্রাহি (Tycho Brahe), কেপলার (Kepler), গ্যালিলিও (Galileo) প্রভৃতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের ফলে আকাশে বিভিন্ন গ্রহের অস্বাভাবিক গতির রহস্য তো জানতে পারা গেল। কিন্তু গ্রহের আসল রূপ তখনও মানুষের কাছে অজানা। কেন অজানা তা তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছ। শুধু চোখে রাতের আকাশে গ্রহদের গতি ছাড়া বিশেষ কিছুই দেখা সম্ভব নয়, সুতরাং তাদের বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া অসম্ভব।

17শ শতাব্দীতে দূরবীন আবিষ্কারের পর এই বড় সমস্যাটাও দূর হলো।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে দেখলেন শুধু চোখে যা মাত্র আলোর বিন্দু বলে মনে হয় দূরবীনে তা আর বিন্দু থাকে না। তাকে ছোট আলোর চাকতির মত দেখায়। সে সব চাকতি আকারে বড় ছোট, তাদের রং ভিন্ন। কারও গায়ে আবার ডোরা কাটা নক্সা আছে; কারও দেখা গেল চাঁদের মত কলা যা নিয়মিত বাড়ে ও কমে। দূরবীনের আবিষ্কার যেন গ্রহজগতের অধ্যয়নে এক বন্ধ দ্বার খুলে দিল। পরবর্তীকালে দূরবীনের সাহায্যেই সৌরমণ্ডলের আরও তিনটি গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেল। সবে মিলে গ্রহের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ালো নয়।

সূর্য এবং নটি গ্রহ নিয়ে তৈরী আমাদের সৌরমণ্ডল। নটি গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দূরত্বের উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে যাচ্ছে। সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ, খুবই ছোট গ্রহ, আয়তন পৃথিবীর মাত্র ছয় শতাংশ। বুধের পর শুক্র, আয়তনে পৃথিবীর জুড়ি। এর পর আছে আমাদের পৃথিবী, সৌরমণ্ডলের তৃতীয় গ্রহ। পৃথিবীর পর মঙ্গল, আর একটি ছোট গ্রহ, আয়তন পৃথিবীর সাত ভাগের একভাগ। মঙ্গলের পর সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি, আয়তন পৃথিবীর একহাজার তিনশ' গুণেরও বেশী। তারপর আছে শনি, পৃথিবীর চেয়ে সাড়ে সাতশ গুণ বড়। শনির পর আছে প্রায় একই সাইজের দুটি গ্রহ ইউরেনাস ও নেপচুন, আয়তন পৃথিবীর প্রায় ষাট গুণ। সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের গ্রহ হলো প্লুটো, আয়তনে প্রায় বুধের মতই ছোট। এই নটি গ্রহ ছাড়াও আছে অসংখ্য ছোট বড় নানা সাইজের পাথরের টুকরো যাদের বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ। এই গ্রহাণুপুঞ্জও অন্যান্য গ্রহদের মতই নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝখানে।

সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহের আয়তনের তুলনায় তাদের মধ্যেকার দূরত্ব যে কি বিশাল তার আন্দাজ একটা সামান্য উদাহরণ থেকে সহজেই বুঝতে পারবে। যদি আমরা ধরে নিই যে কলকাতার ইডেনের খেলার মাঠটা হলো আমাদের সৌরমণ্ডল তবে তার মাঝখানে আমাদের সূর্যের সাইজ হবে একটা ছোট পিং পং বলের মত। তার থেকে 80 সেন্টিমিটার দূরে থাকবে বুধ; 1·4 মিটার দূরে শুক্র আর ঠিক 2 মিটার দূরে আমাদের পৃথিবী। পৃথিবীর পর আরও 1 মিটার দূরে থাকবে মঙ্গল। আমাদের ইডেনের মাপকাঠিতে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে দূরত্ব হবে প্রায় 7·5 মিটার। তারপর আরও 8·6 মিটার দূরে থাকবে শনি। শনির পর ইউরেনাস থাকবে প্রায় 19 মিটার দূরে আর নেপচুন আরও 22 মিটার দূরে। সৌরমণ্ডলের দূরতম গ্রহ প্লুটোর দূরত্ব আমাদের পিং পং বলের সাইজের



সৌরমণ্ডলের গ্রহের তুলনামূলক আয়তন।

সূর্য থেকে হবে প্রায় 80 মিটার, মানে সূর্য থেকে বুধের যা দূরত্ব তার ঠিক একশো গুণ।

এখানে একটা কথা বলা হয়নি। তা হলো, আমাদের ইডেনের সাইজের সৌরমণ্ডলে গ্রহগুলির আয়তন কি দাঁড়াবে। সামান্য হিসেব করলেই দেখা যাবে যে এই স্কেলে শনি এবং বৃহস্পতি হবে ছোট বা মাঝারি সাইজের মটর দানার মত, ইউরেনাস ও নেপচুন সাগুদানার সাইজের। আর বাকি সব গ্রহের সাইজ হবে সরষে দানার চেয়েও ছোট।

দূরত্ব হিসেবে প্রতিটি গ্রহের আপন আপন কক্ষপথে পরিক্রমণের গতি ভিন্ন। সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধের সূর্যকে একবার পরিক্রমা করতে সময় লাগে আমাদের হিসেবে মাত্র 88 দিন। মানে বুধের এক বছর পৃথিবীর 88 দিনের সমান। শুক্রের পরিক্রমণের সময় লাগে প্রায় 225 দিন, পৃথিবীর 365 দিন, মঙ্গলগ্রহের 687 দিন, বৃহস্পতির প্রায় 12 বছর, শনির লাগে সাড়ে 29 বছর, ইউরেনাসের 84 বছর, নেপচুনের 165 বছর আর প্লুটোর লাগে আমাদের পৃথিবীর হিসেবে প্রায় 248 বছর।

কেন এমন হয় সেটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবে। একটা ঢিলে সুতো বেঁধে যদি সেটাকে মাথার উপর ঘোরাতে থাকো তবে দেখতে পাবে যে সুতোটা যদি লম্বা হয় তাহলে খুব আস্তে ঘোরালেও ঢিলটা ঠিক ঘুরতে থাকবে, মাটিতে পড়ে যাবে না। কিন্তু সুতো যদি ছোট হয় তাহলে ঢিলটাকে গতিশীল অবস্থায় রাখবার জন্য সেটা অনেক বেশী জোরে ঘোরাতে হবে। সৌরমণ্ডলের বেলায়ও ব্যাপারটা প্রায় একই রকম। তবে এখানে সুতোর টানের বদলে আছে সূর্যের অভিকর্ষ যা সবকটি গ্রহকে এক অদৃশ্য টানে বেঁধে রেখেছে।

আকার এবং দূরত্ব ছাড়াও গ্রহগুলির আরও একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। তা হলো এদের গঠনে। বুধ, শুক্র, মঙ্গল এবং প্লুটো - এদের গঠন হলো আমাদের পৃথিবীর মতই। পৃথিবীর মত এরাও মাটি পাথরের তৈরী। অপরদিকে বৃহস্পতি ও শনি হলো সম্পূর্ণ ভাবে বাষ্পীয় পদার্থের তৈরী। সেজন্য পৃথিবীর তুলনায় এদুটি গ্রহের ঘনত্ব অত্যন্ত কম, মানে আয়তনের অনুপাতে এদের ওজন খুবই অল্প। ইউরেনাস ও নেপচুনও বাষ্পীয় পদার্থের তৈরী, তবে সূর্য থেকে বহু দূরে থাকার দরুন এরা এত ঠাণ্ডা যে দুটি গ্রহই বস্তুতঃ জমাট বাঁধা গ্যাসের বরফের তৈরী।

গ্রহ এবং গ্রহানুপুঞ্জ ছাড়াও সৌরমণ্ডলে আছে গোটা পঞ্চাশেক ছোট বড় নানা

সাইজের উপগ্রহ যা বিভিন্ন গ্রহের চারদিকে কক্ষপথে ঘুরছে। কেবল বুধ এবং শুক্রের কোনও উপগ্রহ নেই। অপরদিকে আবার একা শনির উপগ্রহের সংখ্যাই হলো 17। মানে সৌরমণ্ডলের মোট উপগ্রহের শতকরা 40 ভাগেরই মালিক হলো শনি। এছাড়া শনিগ্রহের আরও একটি বিশেষত্ব হলো তার সুন্দর বলয় সমূহ। আজ অবশ্য আমরা জানতে পেরেছি যে শনি ছাড়া আরও তিনটি গ্রহ —বৃহস্পতি, ইউরেনাস এবং নেপচুনেরও নিজস্ব বলয় আছে। তবে শনির বলয়ের তুলনায় সেগুলি অত্যন্ত পাতলা।

গত কয়েক দশকে মহাকাশ অভিযানের ফলে সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির বিষয় আজ আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি যা এর আগে অজানা ছিল। গ্রহ সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণাও ভেঙে গেছে। মানবরহিত মহাকাশ যানগুলি ইতিমধ্যে বিভিন্ন গ্রহ থেকে যে সব ছবি ও বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠিয়েছে সেগুলি অধ্যায়ন করে গ্রহ বিজ্ঞানীরা গ্রহের উৎপত্তি, গঠন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। সে সব কথাই এবার তোমাদের বলবো।

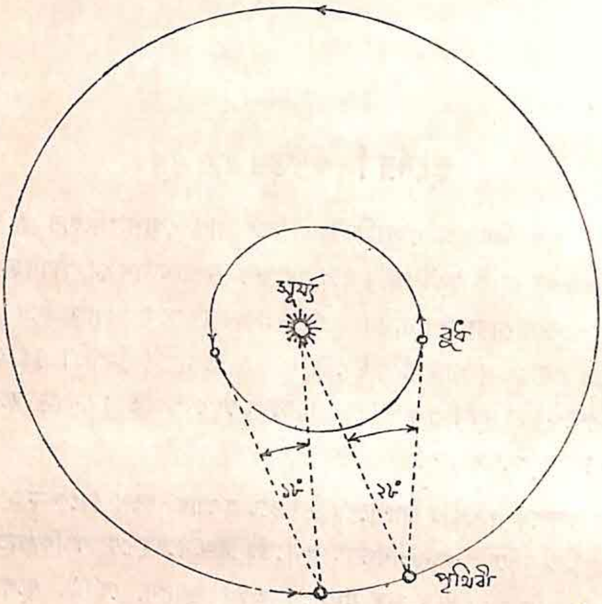
সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ

শোনা যায় বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ নিকোলাস কোপারনিকাস (Nicolas Copernicus) নাকি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আক্ষেপ করেছিলেন যে জীবনকালে তিনি কখনও বুধগ্রহকে দেখতে পাননি। তোমরা হয়ত শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছো। কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। আসলে গ্রহ হিসাবে বুধ এত ছোট আর সূর্য থেকে এর দূরত্ব এত কম যে আকাশে সে বেশীর ভাগ সময়ই সূর্যের প্রখর তেজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

বুধের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের ভেতরে হওয়ার দরুন বুধকে কখনও ভোরে সূর্যোদয়ের ঠিক আগে, কখনও সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের ঠিক পরেই কেবল কিছুক্ষণের জন্যে দেখা সম্ভব। তবে সে সময় যদি আকাশে একটু কুয়াশা, ধোঁয়া, ধুলো বা মেঘ থাকে তাহলে আর বুধের দেখা পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। সুতরাং বুঝতেই পারছো জ্যোতির্বিদ কোপারনিকাসের কেন বুধকে দেখবার সৌভাগ্য হয় নি।

আগেই বলেছি, গ্রহ হিসাবে বুধের আকার নিতান্তই ছোট। সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে ছোট এই গ্রহটির ব্যাস মাত্র 4880 কিলোমিটার। যদি তোমরা মনে রাখো যে আমাদের চাঁদের ব্যাস হলো 3476 কিলোমিটার, তাহলেই বুধ যে সত্যিই কত ছোট তার একটা আন্দাজ পেতে পারো।

আকার ছাড়াও, বুধের কক্ষপথ অন্য সব গ্রহের কক্ষপথের চেয়ে ছোট। সূর্য থেকে বুধের দূরত্ব 4 কোটি 60 লক্ষ কিলোমিটার থেকে নিয়ে 6 কোটি 98 লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত কমে বাড়ে। আবার সূর্যের খুবই কাছে আছে বলে কক্ষপথে বুধের গতিবেগও সবচেয়ে বেশী, গড়ে সেকেণ্ডে প্রায় 48 কিলোমিটার। তবে এই গতি সবসময় এক থাকে না। কেপলারের সূত্র অনুসারে গতিবেগ নির্ভর করে সূর্য থেকে আসল দূরত্বের ওপর। বুধের বেলায় দেখা গেছে যে, যখন দূরত্ব সবচেয়ে বেশী, মানে 6 কোটি 98 লক্ষ কিলোমিটার, তখন কক্ষপথে তার গতিবেগ সবচেয়ে কম, মানে সেকেণ্ডে প্রায় 37 কিলোমিটার। অপর দিকে দূরত্ব যখন সবচেয়ে কম, মানে 4 কোটি 60 লক্ষ কিলোমিটার বুধের গতিবেগ তখন হয় সবচেয়ে বেশী। সেকেণ্ডে সে তখন প্রায় 56 কিলোমিটার এগিয়ে যায়।



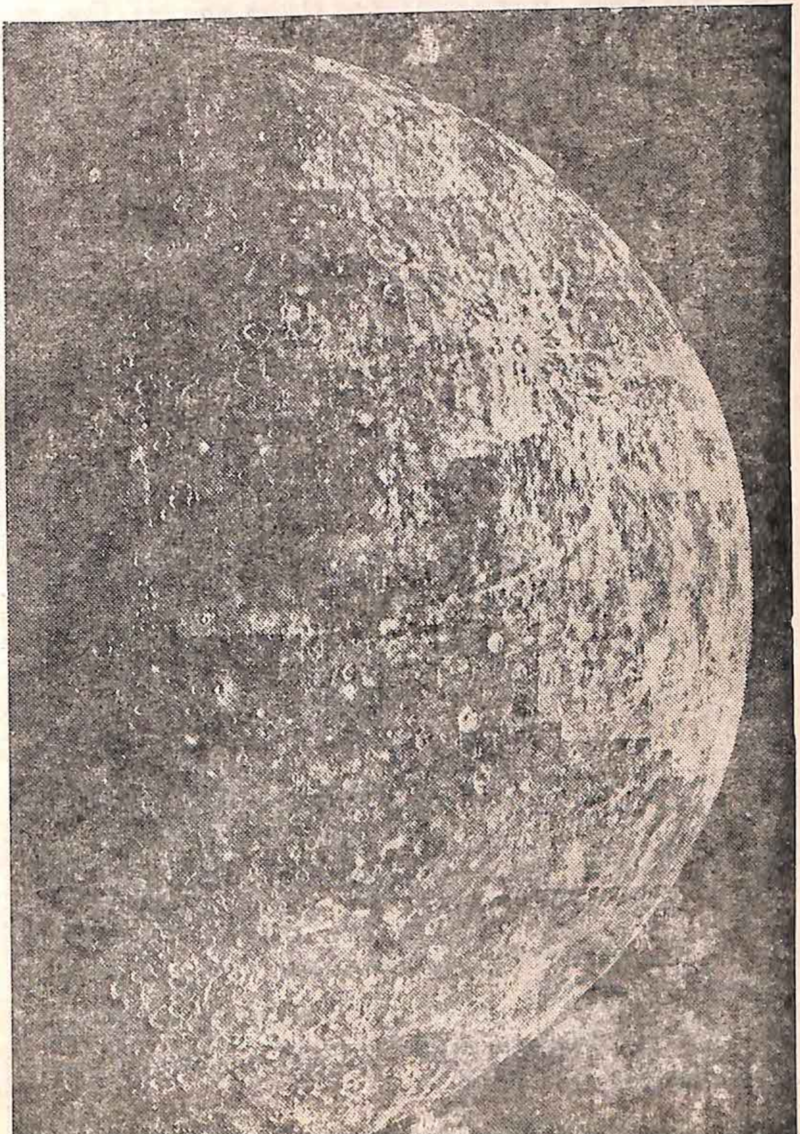
বুধ ও পৃথিবীর কক্ষপথ। বুধ কখনোই সূর্য থেকে 28 ডিগ্রীর বেশী দূরে যায় না—
তার ফলে বেশীর ভাগ সময়েই বুধ সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় হারিয়ে যায়।

এই দ্রুতগতির জন্য, অনুকূল পরিবেশ হলেও বুধকে আকাশে খুব কম সময়েই একই জায়গায় দেখা যায়।

পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণের নানা অসুবিধার জন্য দূরবীনের আবিষ্কারের পরেও বুধের বিষয় বেশী কিছু জানা সম্ভব হয়নি। শুধু জানা গিয়েছিল যে চাঁদের মত বুধের গায়েও আবছা দাগ আছে। আবার ঐ সব দাগের গতি অধ্যয়ন করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরামনে করেছিলেন যে বুধ নিজের অক্ষে একবার পাক খায় 88 দিনে। মানে, সূর্যের কক্ষে একবার প্রদক্ষিণ করতে বুধের যত সময় লাগে ঠিক তাই। এর ফলে বৈজ্ঞানিকেরা ভেবেছিলেন আমাদের চাঁদের মত বুধেরও একটাই দিকই হয়ত সব সময় সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। কিন্তু আজ আমরা জানতে পেরেছি যে এসব ধারণা ছিল ভুল।

1965 সালে বিশেষ ধরনের রেডিও সংকেতের সাহায্যে অধ্যয়নের ফলে জানতে পারা গেল যে আসলে বুধ নিজের অক্ষে একবার পাক খায় মাত্র 59 দিনে। এর মানে হলো এই যে, যে সময় বুধ নিজের অক্ষে তিন পাক খায় সে সময়ের মধ্যে সে সূর্যকে দুবার প্রদক্ষিণ করে আসে। আর এই অদ্ভুত সমন্বয়ের ফলে

বুধের ওপর এক 'দিন' এর দৈর্ঘ্য হয় প্রায় আমাদের 176 দিনের সমান। তাছাড়া বুধের আকাশে সূর্যের গতিও হয় অস্বাভাবিক।



মেরিনার-10 থেকে তোলা বুধ গ্রহের ছবি। দেখতে ঠিক আমাদের চাঁদের মত। তাই না?

যদি বুধের ওপর সূর্যোদয়ের ঠিক আগে কেউ সেখানে গিয়ে পৌঁছয় তাহলে সে দেখবে যে সূর্য প্রথমে পৃথিবীর মতই পূর্ব দিগন্তে উদিত হবে। কিন্তু উদয় হওয়ার পর কিছুক্ষণ আকাশে স্থির থেকে আবার সে পূর্ব দিগন্তেই অস্ত যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার একবার সূর্যোদয় হবে পূর্বদিগন্তে। দ্বিতীয়বার উদয় হওয়ার পর বুধের আকাশে পুব থেকে পশ্চিমে যেতে সূর্যের সময় লাগবে প্রায় 88 দিন, মানে, বুধের এক বছর। তারপর, উদয় হওয়ার মত পশ্চিমে সূর্য অস্তও যাবে দুবার। অর্থাৎ একবার পশ্চিমে অস্ত যাওয়ার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে আবার সূর্যোদয় হবে, তারপর দ্বিতীয় বার অস্ত যাবে। বেশ মজার ব্যাপার তাই না?

এখানে একটা কথা বলে রাখি। এই যে দু-দুবার বুধের আকাশে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়া, এটা হয় কেবলমাত্র কক্ষপথে বুধের গতিবেগের কমবেশী হওয়ার দরুন। যার ফলে বুধ যখন সূর্যের সব চেয়ে কাছে আসে তখন বুধের আকাশে সূর্যকে খুব অল্প সময়ের জন্য পশ্চিম থেকে পুব দিকে চলতে দেখা যায়।

সূর্য থেকে কম দূরত্ব আর অত লম্বা 'দিন' হওয়ার দরুন সহজেই অনুমান করা যায় যে বুধের ওপর তাপমাত্রা খুব বেশী হবে। দূরবীনে বিশেষ যন্ত্র লাগিয়ে দেখা গেছে যে বুধের যে দিক সূর্যের দিকে ফেরানো থাকে (মানে যে দিকে দিন) সে দিকের উপরিতলের তাপমাত্রা 400 ডিগ্রী সেলসিয়সেরও বেশী। মানে সে উত্তাপে সীসা বা দস্তার মত ধাতু অনায়াসে গলে যাবে। আবার সূর্যের বিপরীত দিকের তলের (মানে যে দিকে রাত) তাপমান পাওয়া গেছে শূন্যেরও প্রায় 100 ডিগ্রী নীচে।

বুধের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের ভেতরের দিকে হওয়ার দরুন একটা বিশেষ ঘটনা মাঝে মাঝে দেখা যায় যা অনেকটা আমাদের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের মত। সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ কালে প্রায়ই বুধ সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে। সে সময় যদি সূর্য, বুধ এবং পৃথিবী একই সরল রেখায় থাকে তবে বুধকে সূর্যের চাকতির ওপর ছোট কালো বিন্দুর মত দেখায় যা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সূর্যের গায়ে এক পাশ থেকে অন্য পাশে সরে যেতে দেখা যায়। এই ঘটনাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন সংক্রমণ (ইংরাজীতে বলা হয় transit)। যদি পৃথিবী এবং বুধের কক্ষপথ একই সমতলে হতো তবে প্রতি বছরে তিন বার এরকম ঘটনা দেখা যেত। কিন্তু আসলে তা হয় না, কারণ বুধের কক্ষ পথ এবং পৃথিবীর কক্ষ পথ এক সমতলে নেই, আছে 7 ডিগ্রী কোনাকুনি ভাবে। ফলে সূর্যের সামনে বুধের সংক্রমণ হয় সাধারণতঃ সাত বা তের বছর পরে পরে। আর তাও হয় কেবলমাত্র মে এবং নভেম্বর

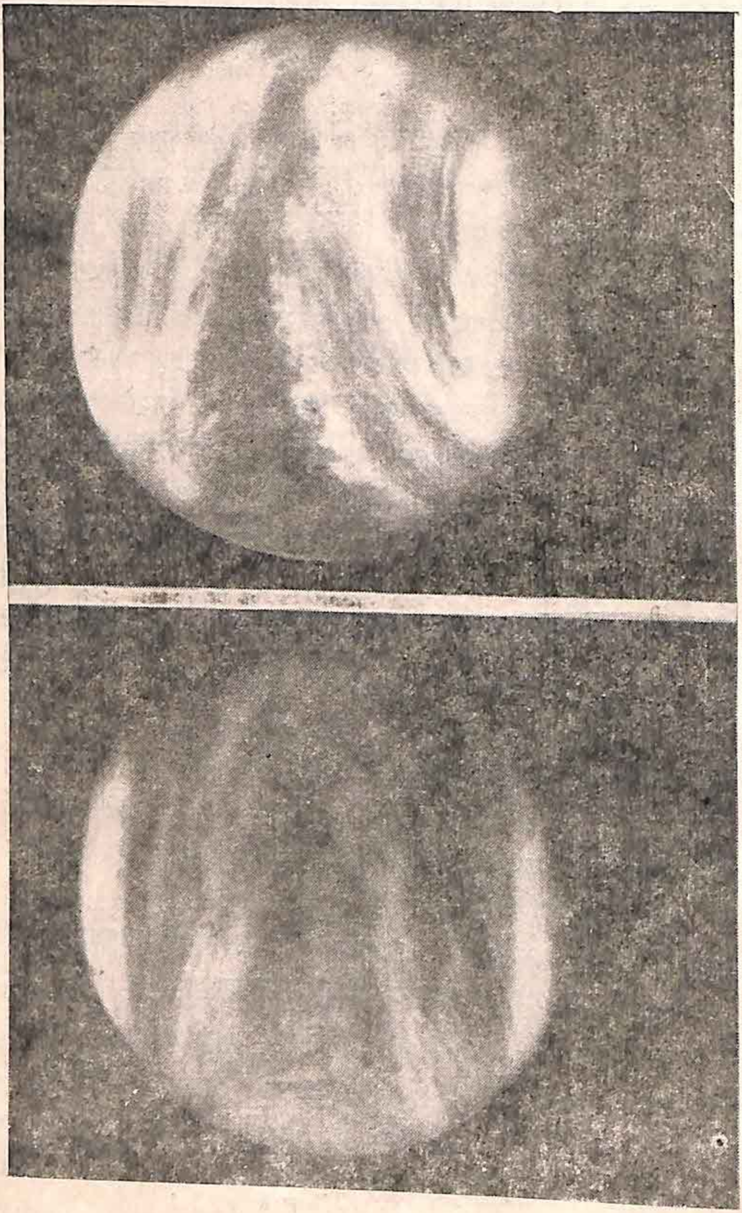
মাসে। গত 1973 সালের 10ই নভেম্বর বুধের সংক্রমণ দেখা গিয়েছিল। এই শতকে আবার দেখা যাবে 13ই নভেম্বর 1986, 6ই নভেম্বর 1993 এবং 15ই নভেম্বর 1999 তারিখে।

এতক্ষণ বুধের বিষয় যা কিছু বললাম তা ছিল কেবলমাত্র পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণের ফলে যা জানতে পারা গেছে সে সব কথা। তবে পৃথিবী থেকে বুধের গঠন সম্বন্ধে কোনও তথ্যই প্রায় পাওয়া যায়নি। সে বিষয়ে প্রথম খবর পাওয়া গিয়েছিল মার্কিন মহাকাশ যান মেরিনার—10 থেকে। 1974 সালে মেরিনার —10 মহাকাশযান সর্ব প্রথম কাছ থেকে বুধের ছবি তুলে পাঠায়। সে সব ছবিতে দেখা গেল যে বুধের উপরিতল অবিকল আমাদের চাঁদের মত। সেখানেও মাটি অসংখ্য গর্তে ভরা এবড়ো খেবড়ো। আরও রয়েছে পাহাড় আর বিশাল সমতলভূমি। আরও দেখা গেল যে চাঁদের মত বুধেরও এক গোলার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত মশৃণ, মানে কম এবড়ো খেবড়ো। বুধের গঠনের বিষয়ও নতুন তথ্য পাওয়া গেল। মেরিনারের পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করলেন যে বুধের বাইরের গঠন চাঁদের মত হলেও তার ভেতরটা ঠিক আমাদের পৃথিবীর মত। এখানে একটা কথা তোমাদের বলে দিই যে সৌরমণ্ডলে বুধই কেবল এক-মাত্র গ্রহ যার ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের প্রায় সমান। বুধের ঘনত্ব হলো 5·5, পৃথিবীর 5·5, চাঁদের **3·3**।

মেরিনার আরও খবর পাঠালো যে বুধের খুবই হাল্কা বায়ুমণ্ডল আছে যা হিলিয়ম গ্যাসের তৈরী। এছাড়া বুধের নিজস্ব চুম্বকীয় ক্ষেত্রের অস্তিত্বও পাওয়া গেছে, যদিও তা আমাদের পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রেয় তুলনায় খুবই ক্ষীণ। তবে বুধের ঐ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের উৎস কি তা আজও জানা যায়নি।

কিছু বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে পৃথিবীর মত বুধের অভ্যন্তরভাগও ভারী লোহার তৈরী আর সেই লোহাই হলো তার চুম্বকীয় ক্ষেত্রের উৎস।

———



মেরিনার-2 থেকে তোলা শুক্রগ্রহের ছবি। ছবিটি অতিবেগুনী ফিলটার দিয়ে তোলা হয়েছে।

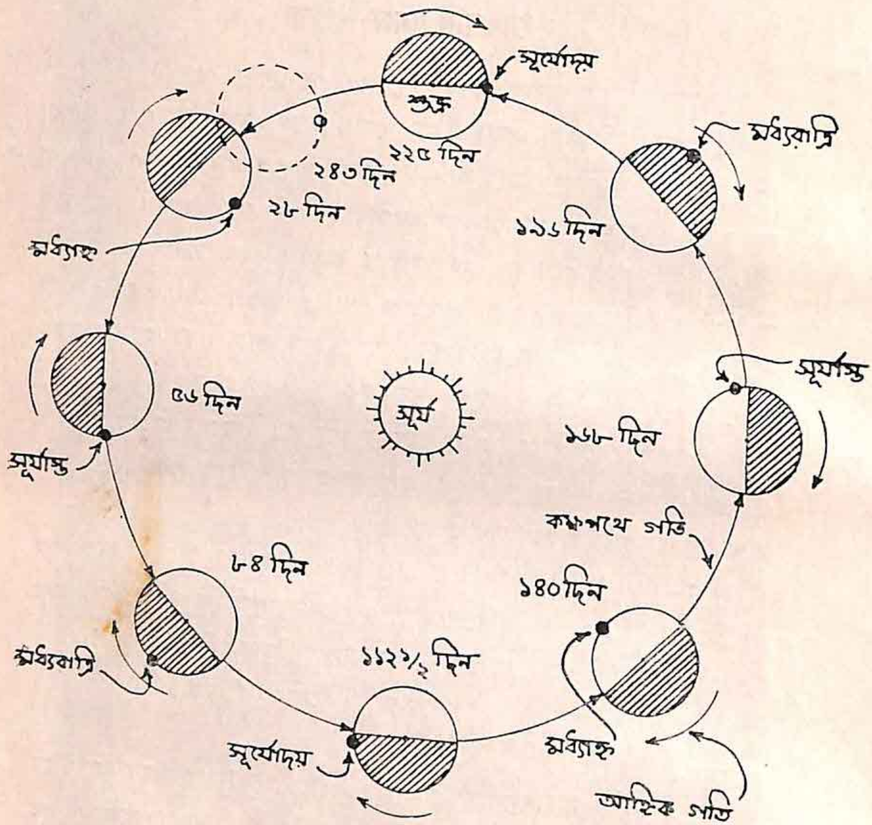
পৃথিবীর যমজ—শুক্র

সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে কিংবা ভোরে সূর্যোদয়ের আগে পূব আকাশে কখনও তোমরা নিশ্চয়ই একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে দেখেছ। একে আমরা সন্ধ্যাতারা বা শুকতারা বলেই জানি। কিন্তু আসলে এটা কোনও তারা বা নক্ষত্র নয়। এ হলো আমাদের সৌরমণ্ডলেরই এক গ্রহ, শুক্র। আকাশে শুক্রকে চেনা মোটেই কঠিন নয়, এর অসামান্য ঔজ্জ্বল্যই একে চিনিয়ে দেয়। সূর্য ও চাঁদকে বাদ দিলে শুক্রই হলো আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। অবশ্য পৃথিবীর থেকে দূরত্ব এবং কক্ষপথে কোথায় আছে তার ওপর এর ঔজ্জ্বল্যের যথেষ্ট তারতম্য হয়। ঔজ্জ্বল্য যখন সবচেয়ে বেশী তখন রাতে শুক্রের আলোয় সাদা দেওয়ালের গায়ে গাছের ছায়া পর্যন্ত দেখা যায়। অবশ্য শহরের আলোয় তা দেখা সম্ভব নয়। তবে আকাশ পরিষ্কার থাকলে গ্রামাঞ্চলের অন্ধকারে তোমরা এ ঘটনা একটু চেষ্টা করলেই দেখতে পারো।

আবার এই অসামান্য ঔজ্জ্বল্যের দরুন কখনও কখনও দিনের আকাশেও শুক্রকেও দেখা যায়। অবশ্য দিনে দেখতে হলে আকাশের ঠিক কোথায় তাকাতে হবে সেটা জানা বিশেষ দরকার। শোনা যায় পরিষ্কার নীল আকাশে ছোট্ট চকচকে রূপোলী বিন্দুর মত শুক্রগ্রহকে দেখে অনেকেই 'উড়ন্ত চাকি' বলে, ভুল করেছেন।

শুক্রের এত বেশী ঔজ্জ্বল্যের এক প্রধান কারণ হলো এর মেঘ। দূরবীনে দেখা যায় যে সমস্ত গ্রহটাই পুরু মেঘের আস্তরণে ঢাকা। দেখা গেছে শুক্রের প্রায় শতকরা 100 ভাগই সব সময় মেঘে ঢাকা থাকে। সে তুলনায় পৃথিবীর মেঘাচ্ছন্ন এলাকার পরিমাণ কখনও গড়ে শতকরা 50 ভাগের বেশী হয় না। নিশ্ছিদ্র সেই মেঘ থেকে ঠিকরে আসা সূর্যের আলোই হলো শুক্রগ্রহের চোখ ধাঁধাঁনো ঔজ্জ্বল্যের কারণ। দূরবীনে ঐ মেঘের আস্তরণ ভেদ করে উপরিতলের কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। আবার সূর্যের প্রতিফলিত আলোয় ঐ মেঘও সবদিক থেকে একই রকম দেখায়, তার মধ্যে এমন কোনও বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন দেখা যায় না যার গতি দেখে গ্রহের আহ্নিক গতির সম্বন্ধে কোনও আভাস পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং শুধু দূরবীন দিয়ে দেখে এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা অসম্ভব।

অবশ্য এ সমস্যার সমাধান হয়েছে সাম্প্রতিক কালের রেডার পদ্ধতির সাহায্যে। বৈজ্ঞানিকেরা শুক্রের উপরিতল লক্ষ্য করে রেডিও তরঙ্গ পাঠিয়ে এবং উপরিতল থেকে প্রতিফলিত রেডিও তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে জানতে পেরেছেন যে শুক্র নিজের



শুক্রের ওপর দিন রাত। শুক্র সূর্যের চার পাশে একবার ঘোরে 225 দিন। অথচ নিজের অক্ষে উল্টো দিকে একবার ঘোরে 243 দিনে। এই বিচিত্র গতির দরুণ শুক্রের ওপরে এক বছরে সূর্য উঠে দু'বার, এবং অস্ত যায় দু'বার। কেমন করে হয়, তাই ছবিতে দেখানো হয়েছে। ছবিতে শুক্রের কালো বিন্দুটি আহ্নিক গতির নির্দেশক।

অক্ষে ঘোরে খুবই মন্থর গতিতে, তাও আবার অন্য সব গ্রহের মত পশ্চিম থেকে পূবে নয়, বরং উল্টোদিকে। পূব থেকে পশ্চিমে একবার পাক খেতে শুক্রের সময় লাগে আমাদের পৃথিবীর হিসেবে 243 দিন। সৌরমণ্ডলের গ্রহদের মধ্যে এটা হলো সবচেয়ে বেশী।

এখন যদি তোমাদের বলি যে সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরতে শুক্রের সময় লাগে মাত্র 225 দিন, তাহলে তোমরা নিশ্চয় মনে করবে যে শুক্রের এক দিন তার এক বছরের চেয়েও বেশী লম্বা। আসলে কিন্তু তা নয়। কক্ষপথে গতির উল্টো দিকে ঘোরার ফলে শুক্রগ্রহের ওপর এক বছরে সূর্য ওঠে দু-বার, অস্ত যায় দু'বার। মানে পৃথিবীর সময়ের হিসেবে প্রায় চার মাস ধরে চলে শুক্রগ্রহের একটি দিন ও একটি রাত। তবে একটা কথা মনে রেখো। ঘন মেঘের আস্তরণ থাকার ফলে শুক্রগ্রহের উপরিতল থেকে সূর্যকে কিন্তু কখনই দেখা যায় না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো এই যে ঘন বায়ুমণ্ডল থাকার দরুন আলোর প্রতিসরণের ফলে সেখানে দিন ও রাতের মধ্যে আলোর বিশেষ কোনও তারতম্য হয় না। দুপুর হোক বা মাঝরাতই হোক না কেন, আলোর মাত্রা সেখানে সব সময়ই পৃথিবীর ঊষাকালের মত। মানে, শুক্রের উপরি তলে দাঁড়িয়ে সূর্য উঠলো কি অস্ত গেল তা বোঝবার কোনও উপায় নেই। ঠিক একই কারণে শুক্রগ্রহের ওপর তাপমাত্রাও সর্বত্র প্রায় এক, দিনে বা রাতে কোনও তফাৎ নেই।

বহুদিন আগেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছিলেন যে শুক্র এবং পৃথিবীর মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। আকার এবং আয়তনে ঐ সাদৃশ্য এত বেশী যে তাঁরা শুক্রকে বলতেন পৃথিবীর যমজ। যেমন ধরো, পৃথিবীর ব্যাস হলো 12, 756 কিলোমিটার, সে তুলনায় শুক্রের ব্যাস হলো 12, 104 কিলোমিটার। অর্থাৎ দুটি গ্রহের আকার প্রায় সমান। আবার মিল শুধু আকারে নয়। দুটি গ্রহের ভর এবং মহাকর্ষও প্রায় একই। তাছাড়া সৌরমণ্ডলের অন্য সব গ্রহের তুলনায় শুক্রই হলো একমাত্র গ্রহ যা পৃথিবীর মাত্র 4 কোটি 1 লক্ষ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে আসে। পৃথিবীর এত কাছে আর কোন গ্রহ কখনও আসে না। এই সব নানা কারণেই বোধহয় বহু প্রাচীন কাল থেকেই শুক্রগ্রহ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে এসেছে। এবং তাঁদের অধ্যয়নের ফলে গ্রহটি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতেও পারা গেছে।

যেমন ধরো, দূরবীনের সঙ্গে নানা রকম ক্যামেরা ও যন্ত্র লাগিয়ে ছবি তুলে এবং তা পরীক্ষা করে বহু বছর আগেই জানতে পারা গিয়েছিল যে শুক্রের বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে কয়লা, কাঠ বা যে কোনও ইন্ধন পোড়ালে প্রচুর পরিমাণে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। আমাদের শরীরে শ্বাসক্রিয়ার সময়ও কার্বন ডাই-অক্সাইড নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। এ সব ছাড়া অগ্ন্যুৎপাতের সময়ও প্রচুর পরিমাণে

কার্বন ডাই-অক্সাইড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। তবে আমাদের পৃথিবীতে এই গ্যাস বায়ুমণ্ডলে বেশীদিন থাকে না কারণ গাছপালা এর বেশীর ভাগটাই শুষে নেয়। বাকিটা বৃষ্টিতে ধুয়ে মাটিতে নেমে আসে। স্থতরাং বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ খুব একটা বাড়তে পারে না। কিন্তু শুক্রের বেলায় ব্যাপারটা অন্যরকম। মনে হয় সেখানে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নেবার উপযুক্ত কোনও প্রক্রিয়াই কার্যকরী নয়।

শুক্রের বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডে প্রাচুর্য দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন যে শুক্রের বায়ুমণ্ডলের চাপ খুব বেশী হওয়া উচিত কারণ কার্বন ডাই-অক্সাইড অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন গ্যাসের তুলনায় অনেক বেশি ভারী। তাছাড়া আরও একটা জিনিস তাঁরা অনুমান করেছিলেন—তা হলো শুক্রের উপরিতলের তাপমান। তাঁদের মতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশি থাকলে তাপমানও খুব বেশি হওয়া উচিত। এর কারণ খুব সোজা। কার্বন ডাই-অক্সাইড এমন একটি গ্যাস যার ভেতর দিয়ে সহজেই সূর্যের আলো যেতে পারে কিন্তু অবলোহিত বা তাপ রশ্মি যেতে পারে না। শুক্রের কার্বন ডাই-অক্সাইডবহুল বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো অনায়াসে গ্রহের উপরিতলে পৌছয় এবং তাকে উত্তপ্ত করে। কিন্তু তারপর সেই উত্তপ্ত উপরিতল থেকে বিচ্ছুরিত তাপ রশ্মি আর বায়ুমণ্ডলের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমান ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানীরা বলেন "green-house effect"। কারণ অনেক ঠাণ্ডা দেশে ফুল ফলের চাষের জন্য অনুরূপ প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়। সেখানে চাষের জন্য ব্যবহার করা হয় বিশেষ ধরনের কাঁচের ঘরের। এখানেও সূর্যের আলো অনায়াসে কাঁচ ভেদ করে ঘরের ভেতরে ঢুকতে পারে, কিন্তু অদৃশ্য তাপ রশ্মি ভেতর থেকে বাইরে বেরোতে পারে না। ফলে, প্রচণ্ড শীতের সময়ও ঘরের ভেতরের তামপান বাইরের তুলনায় অনেক বেশি থাকে।

তোমরা হয়তো ভাবছো শুক্রের মেঘের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো উপরিতলে পৌছয় কি করে। আসলে যে কথাটা এইমাত্র তোমাদের বললাম সেটা হয়ত ঘটেছিল অতীতে কোনও সময় যখন শুক্রের ওপর এত পুরু মেঘের আস্তরণ ছিল না। হতে পারে, তাপমান একটা বিশেষ কোনও মাত্রায় পৌছবার পরই শুক্রের মেঘের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীরা আজও এ সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাননি। তবে তাঁদের অনুমান আজ সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। শুক্রগ্রহ অভিমুখে গ্রহযান পাঠিয়ে জানতে পারা গেছে যে শুক্রের উপরিতলে বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর

বায়ুমণ্ডলের চাপের প্রায় 94 গুণ বেশী। উপরিতলের তাপমান পাওয়া গেছে প্রায় 465 ডিগ্রী সেলসিয়াস। এছাড়া গ্রহযান থেকে পাঠানো তথ্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে পৃথিবীর মত শুক্রের চারপাশেও চুম্বকীয় ক্ষেত্র আছে তবে তা হলো খুবই ক্ষীণ।

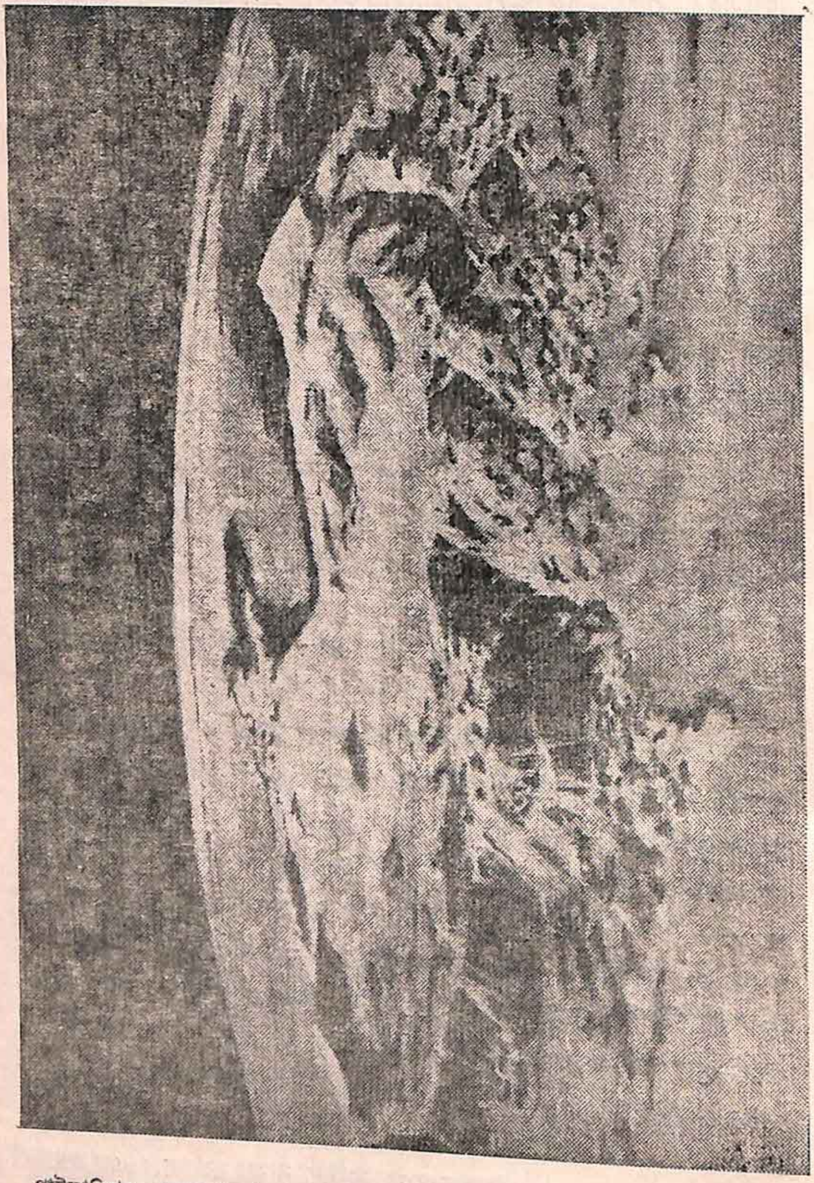
শুক্রগ্রহের অভিমুখে প্রথম গ্রহযান পাঠানো হয় 1961 সালে। সে বছর মে মাসে সোভিয়েত গ্রহযান ভেনেরা-1 শুক্রগ্রহের প্রায় 1 লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তবে এই গ্রহযানটি থেকে বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

শুক্রের রহস্যোদ্ঘাটনে প্রথম বড় রকম ঘটনা ঘটে 1962 সালে। সে বছর 14 ই ডিসেম্বর মার্কিন গ্রহযান মেরিনার-2 (Mariner-2) শুক্রগ্রহের 34,800 কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ দিয়ে কাটিয়ে যাবার সময় গ্রহটি সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়। মেরিনার-2এর পর গত 20 বছরে ডজন খানেকেরও বেশি গ্রহযান শুক্রগ্রহ অভিমুখে পাঠানো হয়েছে।

1967 সালে শুক্রের উপরিতলের মাপজোক নেবার যন্ত্রপাতি সমেত একটি আধার বা ক্যাপস্যুল নামাবার চেষ্টা করেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। সে বছর তাঁদের পাঠানো ভেনেরা-4 (Venera-4) গ্রহযান শুক্রগ্রহে গিয়ে পৌঁছয় 18ই অক্টোবর তারিখে। তারপর গ্রহযান থেকে যন্ত্রপাতি সমেত একটি আধার প্যারাস্যুটের সাহায্যে নামিয়ে দেওয়া হয়। শুক্রগ্রহের ঘন বায়ুমণ্ডলে ভাসতে ভাসতে আধারটি কিছুক্ষণ নিচে নামে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সেটি বায়ুমণ্ডলের প্রচণ্ড চাপে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

ভেনেরা-4 এর শুক্রগ্রহে পৌঁছবার প্রায় 34 ঘণ্টা পর সেখানে পৌঁছয় মার্কিন গ্রহযান মেরিনার-5। তবে এর থেকে কোনও আধার নামানো হয় নি। শুক্রগ্রহের 400 কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মেরিনার-5 থেকে নানা রকম মাপজোক নেওয়া হয় যা থেকে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যায়। এর পর 1969 সালের 16ই ও 17ই মে তারিখে আরও দুটি ভেনেরা গ্রহযান শুক্রের কাছে পৌঁছয়। এদুটি গ্রহযান থেকে যে দুটি আধার নামানো হয় তা ছিল আগের তুলনায় অনেক বেশী মজবুত এবং অনেক বেশি চাপ ও উত্তাপ সহ্য করতে সক্ষম। শুক্রগ্রহের উপরিতলের প্রথম ছবি তুলে পাঠায় সোভিয়েত গ্রহযান ভেনেরা-9। 1975 সালের 22শে অক্টোবর, শুক্রের আশেপাশে পৌঁছবার পর গ্রহযানটি থেকে টিভি ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সমেত একটি আধার নামিয়ে দেওয়া হয়। আধারের যন্ত্রপাতি শুক্রগ্রহের মাটিতে নামার পর প্রায় এক ঘণ্টা সক্রিয় থাকে এবং সে সময়েই উপরিতলের ছবি তুলে পাঠায়। সেই ছবি দেখে

জানা যায় যে ঘন মেঘে ঢাকা থাকা সত্বেও শুক্রগ্রহের উপরিতলের আলোকচিত্র নেবার মতো যথেষ্ট আলো রয়েছে।



পাইয়োনিয়ার–ভেনাস গ্রহযান থেকে রেডার পদ্ধতিতে তোলা শুক্র গ্রহের পাহাড়ের ছবি। ডান·দিকে যে পর্বতশৃঙ্গটি দেখা যাচ্ছে তার মাউন্ট ম্যাকস্ওয়েল। উচ্চতা প্রায় 8·2 কিলো-মিটার, মানে আমাদের এভারেস্টের থেকেও বেশী। এলাকার নাম 'লক্ষ্মী সমতল ভূমি।'

1978 সালের ডিসেম্বর মাসে একটি মার্কিন পাইয়োনিয়ার (Pioneer) গ্রহযান শুক্রের কাছে পৌঁছয় এবং তার কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে ঘুরতে থাকে। তিন বছর ধরে গ্রহযানটি শুক্রের উপরিতলের একটানা জরীপের কাজ চালিয়ে যায়। রেডার পদ্ধতিতে করা এই জরীপের ফলে শুক্রের উপরিতলের প্রায় সবটারই একটা নিখুঁত মানচিত্র তৈরী করা সম্ভব হয়েছে যাতে বিশাল পর্বত, সমতলভূমি এবং আগ্নেয়গিরি দেখতে পাওয়া যায়। এই মানচিত্রেই শুক্রের সর্বোচ্চ পর্বত শিখর মাউন্ট ম্যাক্স্ওয়েল (Mt. Maxwell) এর সন্ধান পাওয়া গেছে।

শুক্রগ্রহের ওপর 1982 সালের মার্চ মাসে আরও দুটি সোভিয়েত গ্রহযান, ভেনেরা-13 এবং ভেনেরা-14 নামানো হয় যা থেকে শুক্রের উপরিতলের প্রথম রঙ্গিন ছবি পাওয়া গেছে।

শুক্র অভিমুখে পাঠানো গ্রহযানগুলি থেকে পাওয়া সবচেয়ে বড় উপলব্ধি হলো উপরিতল থেকে পাঠানো ছবি। তোমাদের আগেই বলেছি যে শুক্র সব সময়েই ঘন মেঘে ঢাকা থাকে আর সেজন্য পৃথিবী থেকে দূরবীন দিয়ে তার উপরিতলের কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। রেডার সংকেত পাঠিয়ে শুক্রের উপরিতলের গঠনের কিছুটা আভাস বিজ্ঞানীরা আগেই পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা ছিল খুবই অস্পষ্ট। গ্রহযান থেকে পাঠানো রঙ্গিন ছবি থেকে আজ আমরা শুক্রের ওপরটা ঠিক কেমন দেখতে তা জানতে পেরেছি। জানতে পেরেছি যে শুক্রের ওপরও বিশাল পাহাড় আছে যার উচ্চতা আমাদের এভারেস্টের থেকেও বেশী, আছে পাথর ছড়ানো বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি আর গর্তে ভরা এবড়ো খেবড়ো জমি। একেবারে আমাদের পৃথিবীর মতই। সেখানে মাটির রং খয়েরি। অনেকটা আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে জমে যাওয়া লাভার মত। কিন্তু শুক্রের উপরিতলে জলের চিহ্নমাত্র নেই, কারণ অত গরমে জল সেখানে তরল অবস্থায় থাকতেই পারে না। শুক্রের বায়ুমণ্ডলেও কিন্তু খুব বেশী জলীয় বাষ্প নেই। তার বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতার পরিমাণ পাওয়া গেছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার মাত্র এক শতাংশ।

শুক্রের ওপর নামানো গ্রহযান থেকে শুক্রের মেঘ এবং মাটি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারা গেছে। জানা গিয়েছে যে শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের মেঘ বিভিন্ন বেগে চলাফেরা করে। সবচেয়ে নিচের স্তরের বেগ খুব বেশী না, কিন্তু মাটি থেকে 70 কিলোমিটার ওপরে, যেখানে শুক্রের মেঘের চূড়া বলা যেতে পারে, সেখানে বেগ প্রায় সেকেণ্ডে 100 মিটার, অর্থাৎ যে বেগে শুক্র নিজের অক্ষে পাক খাচ্ছে তার চেয়েও প্রায় 60 গুণ বেশী। শুক্রের বায়ুমণ্ডলে মেঘের এই চলাচলই হলো সেখানের সর্বত্র একরকম তাপমাত্রার এক প্রধান কারণ।

শুক্রের মেঘে প্রচুর পরিমাণে সালফিউরিক এ্যাসিড জাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণ পাওয়া গেছে। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়াও হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, নিয়ন এবং এমোনিয়া গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এই সব মিলে শুক্রের উপরিতলে অবস্থাটা যে কি ভয়ংকর তা নিশ্চয়ই তোমরা আন্দাজ করতে পেরেছ। এ বিষয়ে একজন বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন যে "শুক্রের ওপর চলাফেরা করাটা প্রায় একটা গরম তেলে ভরা চৌবাচ্চার মধ্যে চলাফেরা করার সমান"।

এখন তোমরা হয়ত প্রশ্ন করবে, আকার এবং আয়তনে এত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও পৃথিবী এবং শুক্রের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এত পার্থক্য কেন ? ব্যাপারটা আগে যত সরল মনে হতো ততটা সরল নয়। বিজ্ঞানীরা আজ জানতে পেরেছেন যে শুধুমাত্র সূর্যের উত্তাপ থেকে শুক্রের তাপমান অত বেশী হতে পারে না, কারণ যতটা সৌরশক্তি শুক্রের ওপর পড়ে তার শতকরা 70 ভাগই মেঘের ওপর থেকে প্রতি-ফলিত হয়ে ফিরে যায়।

প্রাথমিক তথ্যাদি যা ভেনেরা-13 এবং ভেনেরা-14 থেকে পাওয়া গেছে তা দেখে বিজ্ঞানীরা এখন মনে করছেন যে শুক্রের উত্তাপের উৎস হয়ত বিশাল বিশাল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, যার ফলেই হয়ত শুক্রের মেঘেরও উৎপত্তি। কিছু বৈজ্ঞানিক আবার মনে করেন যে আজ থেকে 300 কোটি বছর আগে পৃথিবী যে অবস্থায় ছিল, শুক্র হয়ত বর্তমানে সেই অবস্থায় আছে। তাঁরা মনে করেন সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত শুক্রও পৃথিবীর মত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। হতে পারে, পৃথিবী আর শুক্র যমজ, না হলেও দুই বোন, তফাৎ কেবল তাদের বয়সের।

সুজলা সুফলা আমাদের পৃথিবী

এ্যাপোলো (Apollo) চন্দ্রযান থেকে মহাশূন্যে ভাসমান পৃথিবীকে দেখে কোনও এক মহাকাশচারী মন্তব্য করেছিলেন যে, নীল-সমুদ্র এবং সাদা মেঘে ঢাকা পৃথিবীই হলো মহাকাশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু। এই মন্তব্য কতটা ঠিক তা আমরা জানিনা। কিন্তু একটা কথা আমরা নিঃসংকোচে বলতে পারে। তা হলো, সৌরমণ্ডলের গ্রহদের মধ্যে আমাদের পৃথিবী অদ্বিতীয়। পৃথিবী ছাড়া আর কোনও গ্রহে জীবের আবির্ভাব হয়নি। বলা যেতে পারে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো তার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীব ও উদ্ভিদ জগৎ।

এখন প্রশ্ন হলো, পৃথিবীর কি এমন গুণ আছে যার জন্য সে এই গৌরবের অধিকারী? একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে এর মূলে আছে পৃথিবীর পরিবেশ। যেমন ধরো বায়ুমণ্ডল। ঐ বায়ুমণ্ডলেই আছে জীব ও উদ্ভিদের জীবন ধারনের সমস্ত উপাদান। এছাড়া পৃথিবীর বুকে আছে অপর্য্যাপ্ত জল। পৃথিবীতে জীবনের মূল উৎস হলো ঐ জল আর বায়ুমণ্ডল। অবশ্য অতীতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আজকের মত ছিল না। সে সময় বায়ুমণ্ডলের উপাদান ছিল ভিন্ন, কিন্তু তাতে জীবনের আবির্ভাবের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদান বিদ্যমান ছিল।

অনুকূল বায়ুমণ্ডল ছাড়াও, পৃথিবীর বুকে জীবের আবির্ভাবের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল সূর্যের তাপ ও আলো। সূর্য থেকে পৃথিবী এমনই একটা বিশেষ দূরত্বে আছে যে বুধ ও শুক্রের মত অত্যধিক তাপে পৃথিবী ঝলসে যাচ্ছে না, আবার বাইরের গ্রহগুলির মত ঠাণ্ডায় জমেও যাচ্ছে না।

এক কথায় আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব এবং বিকাশের মূলে আছে পৃথিবীর জল ও মাটি এবং বায়ুমণ্ডল আর সূর্যের পরিমিত তাপ ও আলো। সব কিছুর সমষ্টিগত প্রভাবের ফলই হলো আজকের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পৃথিবী, যেখানে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের আবির্ভাব হয়েছে। এদের যে কোনও একটির যদি অভাব হতো তাহলে হয়ত পৃথিবীর বর্তমান রূপ অন্য রকম হত।



অ্যাপোলো—17 থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি। ছবির উপরের দিকে আরব উপদ্বীপ, লোহিত সাগর ও পূর্ব আফ্রিকার উপকূলবর্তি এলাকা দেখা যাচ্ছে।

পৃথিবীর আকার কি তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। অন্য সব গ্রহের মত পৃথিবীও গোলাকার। নিখুঁতভাবে দেখতে গেলে অবশ্য এটি একটি পূর্ণ গোলক নয়, কারণ পৃথিবীর ধ্রুবীয় ব্যাস এবং নিরক্ষীয় ব্যাসের মধ্যে তফাৎ আছে। তবে এই তফাৎ খুবই সামান্য। সর্বাধুনিক মাপজোক থেকে জানা গেছে যে পৃথিবীর ধ্রুবীয় ব্যাস হলো 12,714 কিলোমিটার, আর নিরক্ষীয় ব্যাস হলো 12,756 কিলোমিটার। মানে মোট তফাৎ মাত্র 42 কিলোমিটারের। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে আরও একটা কথা জানা গেছে। সেটা হলো এই যে, পৃথিবীর দুই মেরুদেশ সমান মাত্রায় চাপা নয়। উত্তর মেরুর দিকে কম চাপা, দক্ষিণ মেরুর দিকে বেশী চাপা। দেখা গেছে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উত্তর মেরুর দূরত্ব দক্ষিণ মেরুর দূরত্ব থেকে প্রায় 40 মিটার বেশী। অবশ্য এ তফাৎ অতি তুচ্ছ।

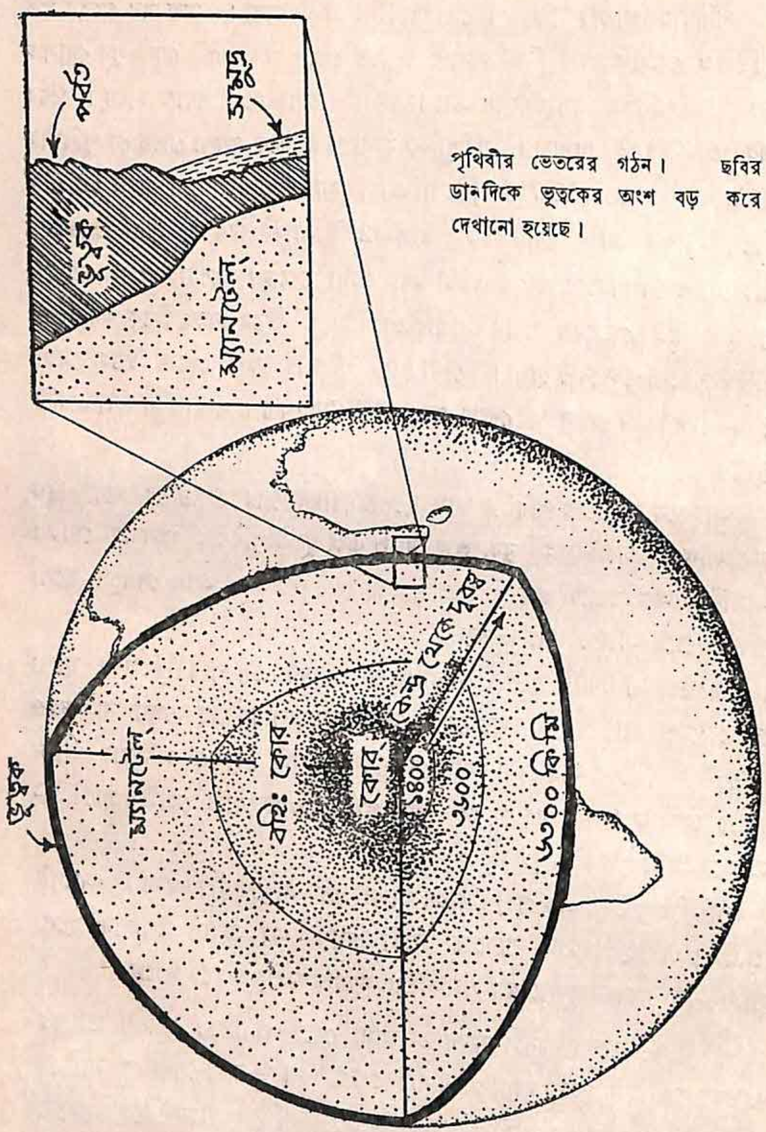
আয়তনে আমাদের পৃথিবীর স্থান হলো সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির মধ্যে ঠিক মাঝামাঝি। চারটি গ্রহ—বুধ, শুক্র, মঙ্গল এবং প্লুটো পৃথিবীর তুলনায় ছোট। অপরদিকে অন্য চারটি গ্রহ—বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, এবং নেপচুন হলো পৃথিবীর চেয়ে আয়তনে অনেক বড়।

আয়তনে মাঝামাঝি হলেও, সৌরমণ্ডলের গ্রহদের মধ্যে পৃথিবীর ঘনত্ব হলো সবচেয়ে বেশী, প্রায় 5·5। আর সেজন্য আয়তনের তুলনায় এর ওজন বা ভরও খুব বেশী। হিসেব করে দেখা গেছে যে পৃথিবীকে যদি কোনও অতিকায় দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করা যায় তবে সে ওজন হবে প্রায় ছ'কোটি কোটি কোটি (মানে 6-এর পরে 21টা শূন্য) টন !

পৃথিবীর ঘনত্বের এক প্রধান কারণ হলো এর আভ্যন্তরীণ গঠন। আগেই বলেছি পৃথিবী হলো মাটি পাথরের তৈরী গ্রহ। এর প্রধান উপাদান হলো লোহা আর পাথর যা ভূপৃষ্ঠের নিচে বিভিন্ন অবস্থায় স্তরীভূত হয়ে আছে।

পৃথিবীর ভেতরের গঠনটা কেমন তা জানা গেছে প্রধানতঃ ভূকম্প তরঙ্গের অধ্যয়ন করে। ভূ-পৃষ্ঠের নানা স্থানে সাইসমোগ্রাফ বা ভূ-কম্প লেখা যন্ত্র লাগিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের মধ্য দিয়ে ভূ-কম্প-তরঙ্গের গতির অধ্যয়ন করে জানতে পারা গেছে যে পৃথিবীর ভেতরের বেশীর ভাগটাই হলো তরল পদার্থের তৈরী।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে মাটি খুঁড়ে যত নিচে নামা যায় তাপমানও তত বাড়তে থাকে। দেখা গেছে ভূপৃষ্ঠের নিচে প্রতি 50 মিটারে তাপমানে প্রায় 1 ডিগ্রী সেল্সিয়স্ বৃদ্ধি হয়। মাত্র 3 কিলো মিটার নিচেকার তাপমাত্রা পাওয়া



পৃথিবীর ভেতরের গঠন। ছবির ডানদিকে ভূত্বকের অংশ বড় করে দেখানো হয়েছে।

গেছে 100 ডিগ্রি সেলসিয়স্ অর্থাৎ জলের স্ফুটনাঙ্কের সমান। ভূপৃষ্ঠের 50 কিলো-মিটার নিচেকার তাপমান এত বেশী যে সেখানে পাথর গলে যায়।

পৃথিবীর অভ্যন্তরের এই তাপের প্রধান উৎস হলো মহাকর্ষ বল। উপরকার পদার্থের প্রচণ্ড চাপের ফলেই ঐ প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়। অবশ্য মহাকর্ষ বল

ছাড়াও ঐ তাপের আর একটি উৎস আছে। সেটা হলো তেজস্ক্রীয় পদার্থের ক্ষয়। তোমরা জানো তেজস্ক্রীয় বা রেডিও ধর্মী পদার্থের ক্ষয়ের ফলে তাপের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরেও প্রচুর তেজস্ক্রীয় পদার্থ আছে যার ক্ষয়ের ফলে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়। ভূ-পৃষ্ঠের কয়েক'শ কিলোমিটার নীচে এই তাপ এত বেশী যে লোহা পাথর সবই গলিত তরল অবস্থায় সবসময় টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে।

তাপমান এবং ভৌত অবস্থার ভিত্তিতে ভূ-কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত এলাকাকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 50 কিলোমিটার নীচে পর্য্যন্ত কঠিন স্তরকে বলা হয় ভূত্বক। এই স্তরটির বেধ পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায় অতি তুচ্ছ। কিন্তু এর ওপরই নির্ভর করে আছে পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবন। কারণ পৃথিবীর মাটি, জল এবং যাবতীয় খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় কেবল মাত্র গ্র্যানাইট ও ব্যাসাল্ট জাতীয় পাথরের তৈরী এই পাতলা আবরণটির মধ্যে।

ভূত্বক থেকে প্রায় 2800 কিলোমিটার গভীরতা পর্য্যন্ত আছে গলিত পাথরের স্তর যাকে বলা হয় 'ম্যানটেল' (mantle)। ভারী ভারী পাথর, লোহা এবং অন্যান্য ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরী এই স্তরটি কিন্তু পূর্ণ তরল অবস্থায় নেই। এর অবস্থা অনেকটা নরম পিচের মত। তাপমান 2000 থেকে 2500 ডিগ্রী পর্য্যন্ত।

ভূপৃষ্ঠের 2800 কিলোমিটার নীচে থেকে নিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় 3600 কিলোমিটার পুরু এলাকা জুড়ে আছে গলা লোহার স্তর যাকে বলা হয় 'কোর' (core)। এই স্তরের নিম্নভাগ, মানে কেন্দ্র থেকে নিয়ে প্রায় 1400 কিলোমিটার দূরত্ব পর্য্যন্ত অংশ প্রচণ্ড চাপের ফলে কঠিন অবস্থাতেই আছে। তবে এখানকার লোহার ঘনত্ব সাধারণ লোহার চেয়ে অনেক বেশী, প্রায় আড়াই গুণ। এখানকার তাপমানও ভয়াবহ। অনুমান করা হয়েছে পৃথিবীর কেন্দ্রের আশপাশের তাপমান কমপক্ষে 4000 ডিগ্রী সেলসিয়স। এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি। অভ্যন্তরের ঐ গলিত লোহার স্তরই হলো পৃথিবীর চুম্বকত্বের প্রধান কারণ।

পৃথিবীর গঠন সম্পর্কে এতক্ষণ যা বললাম তা থেকে বুঝতেই পারছো যে বাইরে থেকে দেখতে মনোরম হলেও পৃথিবীর ভেতরটা কি ভয়ংকর অবস্থায় আছে। কখনও কখনও অবশ্য এর আভাষ বাইরে থেকেও পাওয়া যায়। যেমন ধরো ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের সময়। তবে এসবের থেকেও বেশী চমকপ্রদ

ঘটনা আমাদের পৃথিবীর বুকে অবিরাম ঘটে চলেছে যা কারো চোখে পড়ে না। আজ থেকে কয়েক দশক আগেও এ ঘটনার বিষয় কেউ জানতো না। কেউ জানতো না যে পৃথিবীর বুকে যে সব মহাদেশীয় ভূখণ্ডগুলি আছে তারা চিরকাল এমনটি ছিল না। কেউ জানতো না অতীতে সবকটি মহাদেশ একই বিশালকায় ভূখণ্ডের অংশ ছিল যা কালক্রমে বিভক্ত হয়ে বর্তমান মহাদেশীয় ভূখণ্ডগুলির রূপ নিয়েছে।

তোমরা যদি পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে দেখ তাহলে দেখবে যে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের আকারে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। যদি দুটি মহাদেশের আকারে কার্ড বোর্ড কেটে নাও তাহলে দেখবে zig-saw puzzle-এর দুটির মধ্যে অদ্ভুত 'ফিট্' রয়েছে। মনে হয় যেন একই ভূখণ্ডকে কেটে দুটি মহাদেশ তৈরী করা হয়েছে। এরকমই একটা ধারণা 1912 সালে জার্মান বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড ওয়েগনার (Alfred Wegener)-এর মনে আসে। তাঁর মতে অতীতে পৃথিবীর মহাদেশীয় ভূখণ্ডগুলি একই ভূখণ্ডের অংশ ছিল যা পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান মহাদেশগুলির রূপ নিয়েছে। সে সময় অবশ্য ওয়েগনারের এ ধারণা কেউ বিশ্বাস করেনি।

কিন্তু প্রথমে অবাস্তব মনে হলেও মহাদেশীয় চলনের প্রমাণ ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিকদের হাতে আসতে লাগলো। দক্ষিণ আফ্রিকা, অ্যানটার্কটিকা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে একই প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেল। আবার ভূত্বকের গঠন এবং মাটির নীচে খনিজের ভাণ্ডারের বেলাতেও ঐ একই ব্যাপার দেখা গেল। এ সব ঘটনা থেকে বিজ্ঞানীদের মনে মহাদেশীয় চলনের ধারণা ক্রমশঃ দৃঢ় হতে লাগলো।

এ বিষয় সবচেয়ে মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল সমুদ্রতল থেকে। 1965-70 সালে বিশেষ ধরণের তৈরী আমেরিকান জাহাজ 'গ্লোমার চ্যালেঞ্জার' (Glomar Challenger) থেকে বিভিন্ন সমুদ্রের তলা থেকে মাটি তুলে পরীক্ষা চালানো হলো। দেখা গেল যে তাদের বয়সের মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ রয়েছে যার ব্যাখ্যা কেবলমাত্র মহাদেশীয় চলনের ভিত্তিতেই করা সম্ভব।

বহু বছরের গবেষণার ফলে মহাদেশীয় চলনের সত্যতা আজ প্রমাণীত হয়েছে। জানতে পারা গেছে যে মহাদেশীয় ভূখণ্ডগুলি সত্যই চলায়মান। এই চলনের শুরু হয় আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাত কোটি বছর আগে যখন অতিকায় সেই ভূখণ্ড, বৈজ্ঞানিকেরা যার নাম দিয়েছেন 'প্যানজিয়া' (Pangaea), তার ভাঙ্গন শুরু হয়। তারপর সেই বিখণ্ডিত ভূখণ্ডগুলি বিভিন্ন দিক অভিমুখে 'চলতে' থাকে। সাড়ে সাত কোটি বছর ধরে ভূখণ্ডগুলি আজকের স্থিতিতে এসে পৌঁছেছে। আজ

আমরা জানতে পেরেছি যে অতীতে ভারতীয় ভূ খণ্ডের দক্ষিণ ভাগ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, অ্যানটার্কটিকা মহাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত।

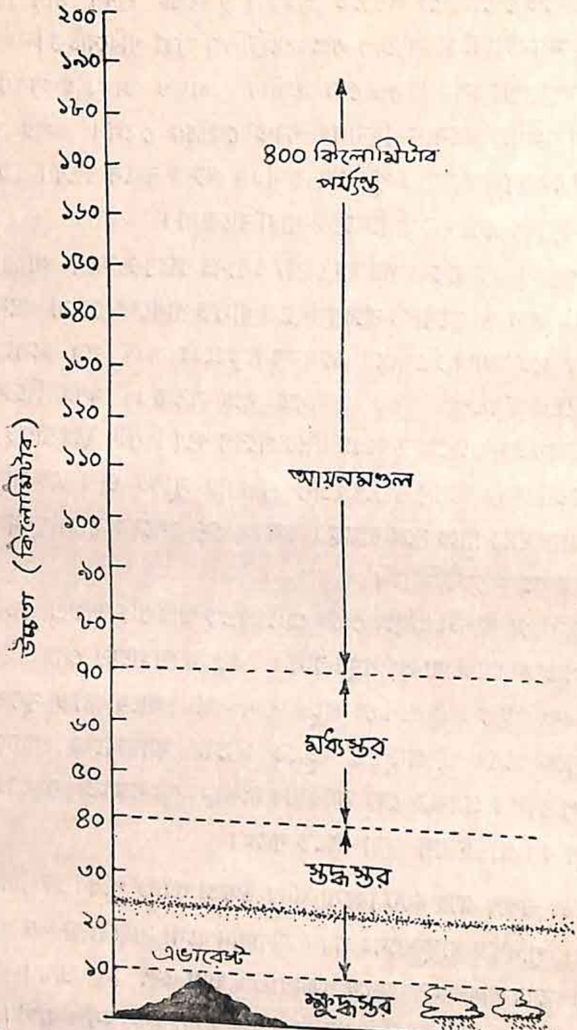
এই মহাদেশীয় চলন আজও শেষ হয়নি। আজও ভারতীয় ভূখণ্ড ক্রমাগত উত্তর মুখে এগিয়ে চলেছে হিমালয় পর্বত শ্রেণীকে ঠেলে। আর তার মানে হলো এই যে সুদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানচিত্র অনেক বদলে যাবে। হয়ত তখন বর্তমান মহাদেশগুলিকে আর চিনতেই পারা যাবে না।

বহু বছরের অনুসন্ধানের পর মহাদেশীয় চলনের কারণও আজ আমরা জানতে পেরেছি। আর তা হলো ভূ ত্বকের নিচের গলিত পাথরের স্তর যা অনেক স্থানে ভূস্তর ভেদ করে ক্রমাগত বেরিয়ে এসে নতুন ভূস্তরের গঠন করে চলেছে। এর ফলে ফাটলের দু'পাশের ভূস্তর ক্রমাগত সরে যাচ্ছে। অপর দিকে পুরানো ভূস্তরও ক্রমাগত মহাদেশীয় ভূখণ্ডের নীচে প্রবেশ করে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই দুই এর মিলিত ক্রিয়ার ফলেই মহাদেশগুলি পৃথিবীর বুকের ওপর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। অবশ্য এই চলনের হার খুবই সামান্য ; বছরে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার।

ভূ পৃষ্ঠের যে অংশটা বাইরে থেকে চোখে পড়ে তার চার ভাগের তিন ভাগই হলো জলে ঢাকা যাকে আমরা সমুদ্র বলি। এছাড়া পাহাড়ের ওপর হিমবাহ বা গ্লেসিয়ার এবং দুই মেরু অঞ্চলে যে প্রচুর বরফ জমে আছে তাও মূলতঃ জল। পৃথিবীর বুকে জলের এই প্রাচুর্য্যই অতীতে জীবের আবির্ভাবের প্রধান সহায়ক ছিল। পৃথিবীতে প্রথম জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল খুব সম্ভবতঃ সমুদ্রের জলে। আজও খুব কম প্রাণীই জল ছাড়া বাঁচতে পারে।

ভূপৃষ্ঠের ওপরে প্রায় 400 কিলোমিটার উচ্চতা পর্য্যন্ত পৃথিবীকে ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান হলো নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। বায়ুমণ্ডলে এদের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা 78 ভাগ এবং 21 ভাগ। বাকি 1 ভাগে আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি অন্যান্য গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প।

পৃথিবীর অভ্যন্তরের মত বায়ুমণ্ডলের গঠনও অনেকটা স্তরীভূত। ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি ; ওপরের দিকে কম। দেখা গেছে, মাটি থেকে মাত্র ছয় কিলোমিটার ওপরে বায়ুমণ্ডলের চাপ মাটির ওপর বায়ুমণ্ডলের চাপের তুলনায় মাত্র অর্ধেক। নয় কিলোমিটার উঁচু এভারেস্টের চুড়োয় চাপ মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ। এত কম চাপে নিঃশ্বাস নেওয়া খুবই কষ্টকর, তাই পর্বতারোহীদের অক্সিজেন গ্যাস সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। রকেট পাঠিয়ে দেখা



পৃথিবীর ঋতু চক্র। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধে জানুয়ারী এবং জুলাই মাসের স্থিতি দেখানো হয়েছে। সূর্যের দিকে হেলে থাকার দরুণ জুলাই মাসে দূরত্ব বেশী হওয়া সত্ত্বেও উত্তর গোলার্দ্ধে গ্রীষ্মকাল হয়।

গেছে, মাটি থেকে 80 কিলোমিটার উঁচুতে বায়ুমণ্ডলের চাপ হয়ে দাঁড়ায় লক্ষ ভাগে এক ভাগ, মানে প্রায় না থাকারই মত।

ভূস্তরের মত বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরেরও নাম আছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে নিয়ে প্রায় 10 কিলোমিটার ওপর পর্য্যন্ত বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরকে বলা হয় ক্ষুব্ধস্তর বা

ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere)। পৃথিবীর আবহাওয়া সংক্রান্ত যত ঘটনা, মানে ঝড় বৃষ্টি, বজ্রপাত, সাইক্লোন ইত্যাদি এই স্তরটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

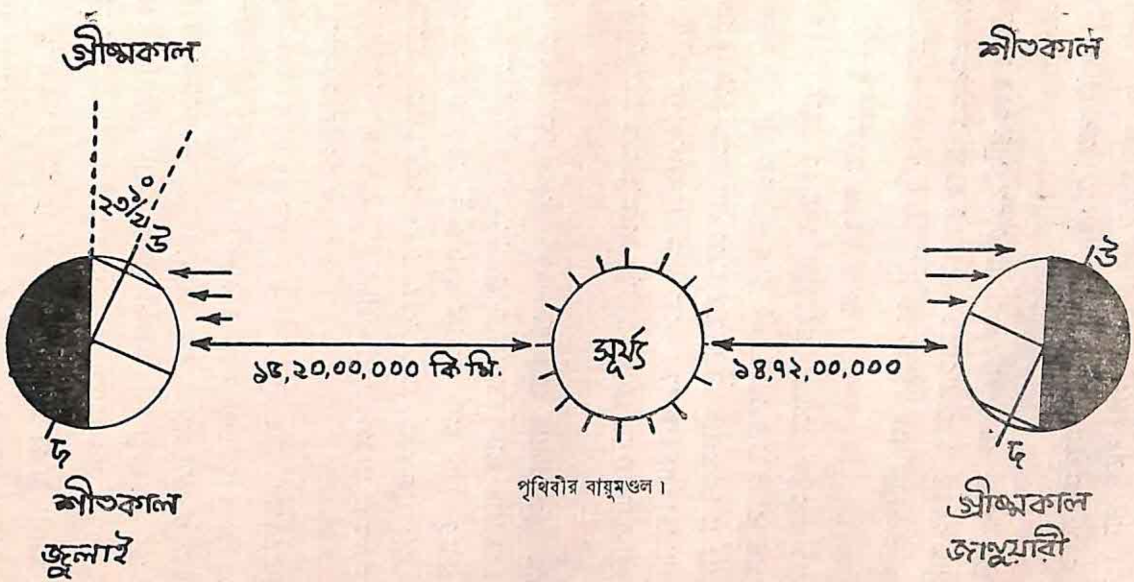
ট্রপোস্ফিয়ারের পর আরও প্রায় 30 কিলোমিটার ওপর পর্যন্ত স্তরকে বলা হয় স্তব্ধস্তর বা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (Stratosphere)। এই স্তরটির বিশেষত্ব হলো এর স্তব্ধতা। এখানে ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, নীচের স্তরের কোনও রেশই এখানে পৌছয় না। কিন্তু কখনও কখনও এখানেও অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। তা হলো 'জেট স্ট্রীম' (Jet-stream) নামক তেজ হাওয়ার প্রবাহ যার গতিবেগ ঘণ্টায় 400 কিলোমিটারেরও বেশী হতে দেখা গেছে।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের এক উল্লেখনীয় উপাদান হলো ওজোন (ozone) গ্যাস। ওজোন গ্যাসের বিশেষত্ব হলো এই যে সূর্য থেকে যে অতিবেগুনী রশ্মি আসে তা এই ওজোনের স্তর ভেদ করে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে অতিবেগুনী রশ্মি হলো প্রাণী জীবনের পক্ষে মারাত্মক। সুতরাং বুঝতেই পারছো স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওজোন পৃথিবীতে প্রাণিজীবনের পক্ষে কতটা লাভ-দায়ক।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওপরের স্তরকে বলা হয় মধ্যস্তর বা মেসোস্ফিয়ার (mesosphere)। তারপর 70 কিলোমিটার ওপর থেকে নিয়ে প্রায় 400 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাক) জুড়ে আছে বায়ুমণ্ডলের সর্বশেষ স্তর আয়নমণ্ডল বা আয়নোস্ফিয়ার (ionosphere)। নাম দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে এখানে আয়নিত অণুর প্রাচুর্য বেশী। সূর্যের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে এখানের বেশির ভাগ বায়ুকণাই সবসময় আয়নিত অবস্থায় আছে।

আয়নমণ্ডলের এক বিশেষ গুণ হলো এর বেতার তরঙ্গ প্রতিফলন ক্ষমতা যারা ফলে বেতার তরঙ্গ সহজেই বহু দূর পর্যন্ত পাঠানো যায়। বলতে পারি আয়নমণ্ডল না থাকলে হয়ত পৃথিবীতে বেতার তরঙ্গ মারফৎ দূর সঞ্চার আজকের মত সহজ হতো না।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে নদী, পাহাড়, সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল সমেত আমাদের পৃথিবী নিজের অক্ষে একবার পাক খায় ঠিক 24 ঘণ্টায়, যাকে আমরা বলি এক 'দিন'। পৃথিবী ঘোরে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে, তাই আমরা সূর্যকে পূর্ব দিকে উদয় হোতে এবং পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখি। নিজের অক্ষে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসে 365 দিন 6 ঘণ্টায় যাকে আমরা বলি এক বছর। যেহেতু বছর আমরা 365 দিনেই ধরি, বাড়তি 6 ঘণ্টার হিসেব প্রতি 4


গ্রীষ্মকাল
শীতকাল
২৩½°
উ
দ
১৫,২০,০০,০০০ কি.মি.
সূর্য্য
১৪,৭২,০০,০০০
উ
দ
শীতকাল
জুলাই
গ্রীষ্মকাল
জানুয়ারী

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল।

বছর অন্তর মিলিয়ে নেওয়া হয় 1 দিন যোগ করে। সেজন্যই প্রতি লীপ ইয়ারে ফেব্রুয়ারী মাসে 28 দিনের বদলে 29 দিন থাকে।

সূর্য থেকে দূরত্বে পৃথিবী হলো তৃতীয় গ্রহ। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব প্রায় 14 কোটি 96 কিলোমিটার। কিন্তু এই দূরত্ব সারা বছর সমান থাকে না। পৃথিবীর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হওয়ার দরুন এই দূরত্বে বেশ কিছু কমবেশি হয়। যেমন ধরো প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে (উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল) পৃথিবী সূর্যের আরও 24 লক্ষ কিলোমিটার কাছে চলে আসে মানে তখন তাদের মধ্যে দূরত্ব হয় 14 কোটি 72 লক্ষ কিলোমিটার। আবার জুলাই মাসের গোড়ার দিকে (মানে আমাদের গ্রীষ্মকালে) এই দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় 15 কোটি 20 লক্ষ কিলো-মিটার, মানে গড় দূরত্ব থেকে 24 লক্ষ কিলোমিটার বেশী।

তোমরা হয়ত ভাবছো ব্যাপারটা গোলমেলে। শীতকালের চেয়ে গরমকালে পৃথিবী সূর্য থেকে বেশী দূরে থাকে, তা কি করে হয়। আসলে কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পৃথিবীতে আমরা যে ঋতুচক্র দেখি তার প্রধান কারণ হলো, কক্ষতলে পৃথিবীর হেলে থাকা। পৃথিবী তার কক্ষতলে 23·5 ডিগ্রী হেলে থাকার দরুণ জুন-জুলাই মাসে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে এসময় সূর্য থেকে দূরত্ব বেশি হওয়া সত্ত্বেও উত্তর গোলার্ধে সূর্যের তাপ অনেক বেশী পড়ে, মানে সেখানে তখন গ্রীষ্মকালে হয়। পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের বেলায় অবশ্য ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। জুন-জুলাই মাসে সেখানে শীতকাল।

জানুয়ারী মাসে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ হেলে থাকে সূর্যের উল্টো দিকে। সেসময় দূরত্ব কম হলেও উত্তর গোলার্ধে সূর্যের তাপ পড়ে অনেক কম। সেজন্য হয় শীতকাল। দক্ষিণ গোলার্ধে সে সময় হয় গ্রীষ্মকাল।

প্রায় 450 কোটি বছরের পুরানো এই পৃথিবীতে প্রথম জীবকোষের আবির্ভাব হয়েছিল আনুমানিক 350 কোটি বছর আগে। মানুষ আসে তার অনেক, অনেক পরে। সর্বাধুনিক যে তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় পৃথিবীর বুকে প্রথম মানুষের আবির্ভাব ঘটে আজ থেকে প্রায় 15 লক্ষ বছর আগে। তারপর সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর চেহারায় অনেকে পরিবর্তন হয়েছে। মানুষও অনেক বদলে গেছে। মানুষ সভ্য হয়েছে। শহর, নগর গড়ে উঠেছে। কৃষি, কল-কারখানা মোটর, রেল, এরোপ্লেন এসেছে। এমনকি মানুষ চাঁদেও পৌঁছে গেছে।

কিন্তু এসবের সঙ্গে আরও একটা জিনিস এসেছে। পৃথিবীর যে পরিবেশ

ভূত্বকে কি কি আছে

অক্সিজেন	46.6 %
সিলিকন	27.72 %
এ্যালুমিনিয়াম	8.13 %
লোহা	5.00 %
ম্যাগনেসিয়াম	2.09 %
ক্যালসিয়াম	3.63 %
সোডিয়াম	2.83 %
পটাসিয়াম	2.59 %
অন্যান্য	1.41 %

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গঠন

নাইট্রোজেন	78.08 %
অক্সিজেন	20.94 %
আরগন	0.93 %
কার্বন ডাই অক্সাইড	0.03 %
অন্যান্য	0.02 %

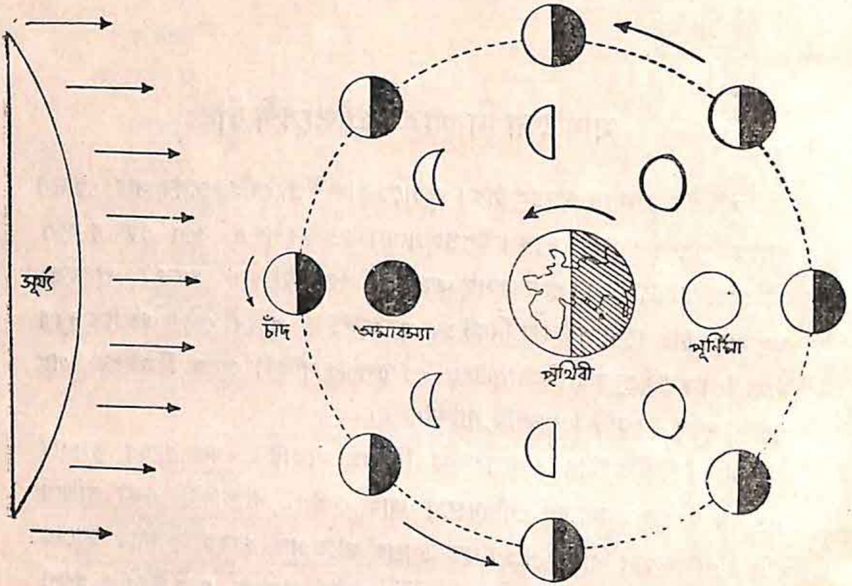
আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে সেই পরিবেশকেই মানুষ আজ ধ্বংস করে চলেছে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা এইভাবে যদি চলতে থাকে আমাদের পৃথিবী হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আর জীবন ধারণের উপযুক্ত থাকবে না। পৃথিবীকে এই পরিণতির হাত থেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হলো ব্যাপক হারে পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা। তা না হলে আমাদের এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা পৃথিবীও হয়ত একদিন সৌরমণ্ডলের অন্য সব গ্রহের মত মৃত গ্রহে পরিণত হবে।

আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী চাঁদ

পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ। প্লুটোকে বাদ দিলে সৌরমণ্ডলের আর কোনও গ্রহের (যাদের উপগ্রহ আছে) উপগ্রহ সংখ্যা এত কম নয়। তবে একমাত্র হলে কি হবে, আমাদের চাঁদ যেন একাই একশ'। এর দুটো কারণ আছে। প্রথমতঃ, মহাকাশে চাঁদ হলো পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী। পৃথিবী থেকে এর গড় দূরত্ব মাত্র 3 লক্ষ 85 হাজার কিলোমিটার (সে তুলনায় পৃথিবী থেকে নিকটতম গ্রহ শুক্রের দূরত্ব 4 কোটি 1 লক্ষ কিলোমিটার)।

চাঁদের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হলো এর বিশাল আকার। মূল গ্রহের তুলনায় এত বড় উপগ্রহ আমাদের সৌরমণ্ডলে আর নেই। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। সৌরমণ্ডলে বিভিন্ন গ্রহের যত উপগ্রহ আছে মূল গ্রহের তুলনায় তাদের আয়তন খুবই ছোট। যেমন ধরো, সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ হলো বৃহস্পতির গ্যানিমীড (Ganymede)। গ্যানিমীডের ব্যাস 5220 কিলোমিটার, মানে আমাদের চাঁদের প্রায় দেড় গুণ। কিন্তু সে তুলনায় বৃহস্পতির ব্যাস 1,42,800 কিলোমিটার। সুতরাং নিজে বিশাল হলেও, বৃহস্পতির তুলনায় গ্যানিমীড খুবই ছোট। বৃহস্পতির যা আয়তন তার মধ্যে প্রায় 21 হাজার গ্যানিমীডকে পুরে রাখা যায়। সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহের বেলায় দেখা গেছে যে তাদের উপগ্রহের ব্যাস মূল উপগ্রহের ব্যাসের 10 ভাগের এক ভাগ বা তারও কম। কিন্তু আমাদের চাঁদের বেলায় ব্যাপারটা অন্যরকম। পৃথিবীর ব্যাস হলো 12,756 কিলোমিটার। সেতুলনায় চাঁদের ব্যাস 3480 কিলোমিটার। মানে পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় 4 ভাগের এক ভাগ। আমাদের পৃথিবীর যা আয়তন তার মধ্যে মাত্র 50টা চাঁদ পুরে রাখা যায়।

এত বড় আর এত কাছে হওয়ার দরুন পৃথিবীর ওপর যে চাঁদের প্রভাব খুব বেশী হবে সেটা স্বাভাবিক। যেমন ধরো চাঁদের আলো। পূর্ণিমার রাতে ধবধবে জ্যোৎস্নার আলো আমরা পাই কেবলমাত্র চাঁদ অত বড় আর অত কাছে আছে বলে। এছাড়া পৃথিবীতে জোয়ার ভাটার প্রধান কারণও হলো চাঁদের টান। আবার এই টানের ফলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে



চাঁদের কলা।

আসছে যার ফলে দিনের দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। অবশ্য এই বৃদ্ধির হার খুবই সামান্য। প্রতি একশো বছরে পৃথিবীর দিন বড় হচ্ছে এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র।

তবে এ সবের থেকেও বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলো চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের। আদিম সভ্যতার যুগ থেকেই চাঁদ মানুষকে আকৃষ্ট করছে। মানুষ দেখে আসছে চাঁদের নিয়মিত বাড়া-কমা বা 'কলা'। শোনা যায় ঐ কলা দেখেই অতীতের মানুষ প্রথম ক্যালেণ্ডার তৈরীর কথা ভেবেছিল। আজও বহুদেশে চান্দ্র মাস ক্যালেণ্ডারে ব্যবহার হয়। আমাদের ক্যালেণ্ডারে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, প্রতিপদ ইত্যাদি যে সব তিথি থাকে তার মূলেও আছে চাঁদের ঐ কলা। এমনকি আমাদের পূজাপার্বণ এবং বিভিন্ন উৎসবাদির তারিখও নির্ধারণ করা হয় চাঁদের কলার ভিত্তিতে।

চাঁদের এই যে দৈনন্দিন বাড়া-কমা, এটা কিন্তু আসলে আমাদের চোখের ভ্রম। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে চাঁদের নিজস্ব কোনও আলো নেই। চাঁদকে আমরা দেখতে পাই সূর্যের প্রতিফলিত আলোয়। কিন্তু যেহেতু চাঁদ পৃথিবীকে পরিক্রমা করছে, সেজন্য চাঁদের পুরো আলোকিত অংশ সব সময় পৃথিবী থেকে

দেখা যায় না। কতটা আলোকিত অংশ দেখা যাবে তা নির্ভর করে পৃথিবী, চাঁদ এবং সূর্যের পারস্পরিক অবস্থানের উপর। চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে থাকে (মানে, আ কাশে চাঁদ ও সূর্যের ব্যবধান যখন শূন্য ডিগ্রী), তখন চাঁদের আলোকিত অংশ থাকে চাঁদের যেদিকে পৃথিবী তার উল্টোদিকে। মানে, তখন পৃথিবী থেকে চাঁদকে দেখাই যায় না। একেই আমরা অমাবস্যা বলি।

অমাবস্যার দু এক দিন পর কাস্তের মত ফালি চাঁদকে দেখা যায় পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের ঠিক পরে। সে সময় আকাশে সূর্য ও চাঁদের ব্যবধান 20 বা 25 ডিগ্রী। এই ভাবে ক্রমাগ ত সরতে সরতে অমাবস্যার প্রায় 7 দিন পর চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য প্রায় এক সমকোণে এসে পৌছয়। আকাশে চাঁদ ও সূর্যের মধ্যে ব্যবধান তখন 90 ডিগ্রী। চাঁদের আলোকিত অংশের আধখানা আমরা এ সময় দেখতে পাই, আর এই আধখানা চাঁদকে সূর্যাস্তের সময় দেখতে পাওয়া যায় আকাশে ঠিক মাথার ওপরে। এর আরও সাতদিন পর চাঁদ গিয়ে পৌঁছয় পৃথিবীর যে দিকে সূর্য তার উল্টো দিকে। তখন পৃথিবী থাকে চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে। আকাশে চাঁদ ও সূর্যের মধ্যে ব্যবধান এখন হয়ে দাঁড়ায় 180 ডিগ্রী। এ সময় চাঁদের পুরো আলোকিত অংশটাই পৃথিবী থেকে দেখতে পাওয়া যায়। এই হলো আমাদের পূর্ণিমা।

পূর্ণিমার পর চাঁদের আলোকিত অংশ আবার ছোট হতে থাকে। পূর্ণিমার সাত দিন পর আবার আধখানা চাঁদ আকাশে দেখা যায়। তবে এ সময় চাঁদ ওঠে মধ্যরাত্রির পর আর সূর্যোদয়ের সময় সে থাকে ঠিক মাথার ওপর। এরও দিন পাঁচেক পর আবার কাস্তে চাঁদ, তবে এবারে তাকে দেখা যায় ভোরে সূর্যোদয়ের ঠিক আগে পূব আকাশে। তারপর আবার আসে অমাবস্যা। এই-ভাবে প্রতি মাসে চলে আকাশে চাঁদের বাড়াকমার চক্র। অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, তারপর আবার অমাবস্যা. তারপর আবার আসে পূর্ণিমা।

পৃথিবী থেকে চাঁদের কলা ছাড়াও আরও একটা বিশেষ জিনিস চোখে পড়ে। তা হলো চাঁদের গায়ে অস্পষ্ট দাগ বা কলঙ্ক। ঐ দাগ কিন্তু আসলে চাঁদের ওপর পাহাড়, গহ্বর আর সমতলভূমি যা দূরবীনে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা যদি প্রতিদিন চাঁদের গায়ের ঐ দাগের দিকে লক্ষ্য রাখো তাহলে দেখবে চাঁদের একটাই দিক সব সময় পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে। তোমরা হয়তো ভাবছো যে তাহলে কি চাঁদ পৃথিবীর মতো নিজের অক্ষে ঘুরছে না? ঘুরছে, তবে সেই ঘোরার একটা বিশেষত্ব আছে। পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরতে

চাঁদের যে সময় লাগে ($27\frac{1}{3}$ দিন), নিজের অক্ষে একবার পাক খেতেও তার ঠিক একই সময় লাগে। এই আশ্চর্য সমন্বয়ের জন্যই আমরা কেবল একটাই দিক পৃথিবী থেকে দেখতে পাই, তবে একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে। তা হলো এই যে পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরতে চাঁদের $27\frac{1}{3}$ দিন লাগে বটে, কিন্তু এক অমাবস্যা থেকে পরের অমাবস্যা কিংবা এক পূর্ণিমা থেকে পরবর্তি পূর্ণিমায় আসতে সময় লাগে একটু বেশী, প্রায় $29\frac{1}{2}$ দিন, যাকে বলা হয় 'চান্দ্র মাস'। এটা হয় কক্ষপথে পৃথিবীর গতির দরুন যার ফলে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চাঁদের আসতে, বা সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে পৃথিবীর আসতে প্রায় 2 দিন বেশী সময় লাগে।

পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের ঘোরার আরও একটা বিশেষত্ব আছে। আগেই বলেছি যে উপগ্রহ হিসেবে চাঁদের আকার খুবই বড়। এত বড় হওয়ার দরুন পৃথিবী যেমন চাঁদকে টানে, চাঁদও তেমনি পৃথিবীকে টানে। এই দুপক্ষের টানা-টানির ফলে আসলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, শুধু যে চাঁদই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে তা নয়, বরং পৃথিবী ও চাঁদ দুজনে দুজনের চারিদিকে ঘুরে চলেছে।

ছোট দূরবীনে চাঁদের গায়ে কালো দাগ দেখে আগেকার কালের বিজ্ঞানীরা মনে করতেন সেগুলি চাঁদের সমুদ্র। এই ধারণা অনুযায়ী সেগুলির নামকরণও করেছিলেন তাঁরা। যেমন শান্ত সাগর (Sea of Tranquillity), স্নিগ্ধ সাগর (Sea of Serenity) অমৃত সাগর (Sea of Nectar), বর্ষণ সাগর (Sea of Rains) ইত্যাদি। পরে শক্তিশালী দূরবীনে দেখা গেল চাঁদে মোটেই জল নেই, সুতরাং সমুদ্রও নেই! কিন্তু নামগুলো রয়েই গেছে। আজ আমরা জানি যে চাঁদের ওপরের যে এলাকাকে আগে সাগর মনে করা হয়েছিল আসলে তা হলো বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি যেখানে অতীতে কোনও সময় চাঁদের ভেতর থেকে লাভা-জাতীয় পদার্থ বেরিয়ে এসে জমাট বেঁধে গেছে। চাঁদের ঐ সমতল ভূমি কিন্তু সম্পূর্ণ সমতল নয়। সেখানে অসংখ্য জালামুখ বা খাদ, ছোট ছোট ঢিবি, সরু লম্বা আঁকাবাঁকা ফাটল ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে।

চাঁদের যে দিকটা আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই তার বেশীর ভাগটাই হলো এবড়ো খেবড়ো—বিশাল বিশাল পর্বতশ্রেণী আর উঁচু দেওয়াল ঘেরা গহ্বরে ভরা। পৃথিবীর মত চাঁদের পর্বতশ্রেণীগুলিরও নাম দেওয়া হয়েছে আলপ্‌স্‌, (Alps) ককেসাস্‌ (Caucasus) ইত্যাদি। চাঁদের সবচেয়ে উঁচু পর্বত শৃঙ্গ 'মাউন্ট লাইব্‌নিৎস' (Mt. Leibnitz,) এর উচ্চতা প্রায় 7900 মিটার।

চাঁদের উপরিতলে সবচেয়ে বেশী করে যে জিনিসটা চোখে পড়ে তা হলো ছোট বড় নানা সাইজের অসংখ্য গহ্বর। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছোট—10, 20 বা 30 কিলোমিটার ব্যাসের। আবার একশো বা দু'শো কিলোমিটার ব্যাসের বিশাল গহ্বরও আছে। চাঁদের গহ্বরগুলো কিন্তু খুব বেশী গভীর নয়, তাদের বেশীর ভাগই বরং উঁচু দেওয়াল ঘেরা ঢালু জমির মত। গহ্বরগুলোর নাম রাখা হয়েছে অতীতের বিখ্যাত লোকের নামে, বিশেষ করে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীদের নামে, যেমন টলেমী (Ptolemy), কোপারনিকাস (Copernicus) গ্যালিলিও (Galileo), নিউটন (Newton), হার্শেল (Herschel) ইত্যাদি। কয়েক বছর আগে বিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডঃ বিক্রম সারাভাই-এর নামেও চাঁদের একটি গহ্বরের নাম রাখা হয়েছে। এছাড়া, চাঁদের উল্টোদিকের তিনটি গহ্বরের নাম আগেই তিনজন ভারতীয় বিজ্ঞানী, জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা এবং হোমী ভাবার নামে রাখা হয়েছিল। চাঁদের সব চেয়ে বড় গহ্বরের নাম ক্লেভিয়াস (Clavius) ; এর ব্যাস 230 কিলোমিটার।

এখন তোমরা হয়ত প্রশ্ন করবে, চাঁদের ওপর এত গহ্বর এলো কোথা থেকে ? এ নিয়ে অনেক মত আছে। তবে আধুনিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলে মাত্র দুটি মত ঠিক বলে মনে হয়। একটি মত অনুসারে, গহ্বরগুলো তৈরী হয়েছে আগ্নেয়গিরির ক্রিয়ার ফলে, যেমন পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মত হলো এই যে, গহ্বরগুলো তৈরি হয়েছে উল্কাপাতের ফলে। চাঁদে হাওয়া নেই, সুতরাং উল্কাপিণ্ড যখন চাঁদের মাটির দিকে নেমে আসে, তখন তার গতিবেগও কমে না আর তা পুড়েও যায় না। ফলে ছোট বড় সব আকারের উল্কাপিণ্ডই প্রচণ্ড বেগে চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়তে পারে যার ফলে গহ্বরের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতেও বহু জায়গায় উল্কাপিণ্ডের আঘাতে তৈরী গহ্বর আছে, তবে বেশীর ভাগই হয়ত আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমাদের দেশে রাজস্থানের লোনার হ্রদও ঐ ভাবেই তৈরী হয়েছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

চাঁদের এত বেশী সংখ্যক গহ্বরের আরও একটা কারণ হলো সেখানে বায়ু-মণ্ডলের অভাব। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে পৃথিবীর ওপর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন ক্রিয়ার ফলে এধরনের প্রাকৃতিক চিহ্ন সহজেই ধুয়ে মুছে যায়। কিন্তু চাঁদে তা হতে পারে না কারণ সেখানে হাওয়া নেই, ঝড় বৃষ্টিও নেই। আর সেজন্য চাঁদের মাটিতে ছোট-খাট দাগও প্রায় চিরস্থায়ী হয়ে যায়। গত দশকে চাঁদের ওপর 12 জন মানুষ নেমে চলে ফিরে বেড়িয়েছে। তারা গাড়িও চালিয়েছে চাঁদের

মাটিতে। এর ফলে তারা চাঁদের মাটিতে রেখে এসেছে অসংখ্য জুতোর ছাপ আর গাড়ির চাকার দাগ। ঐ সব দাগও আজ থেকে হাজার হাজার বছর বাদে ঠিক একই রকম থাকবে।

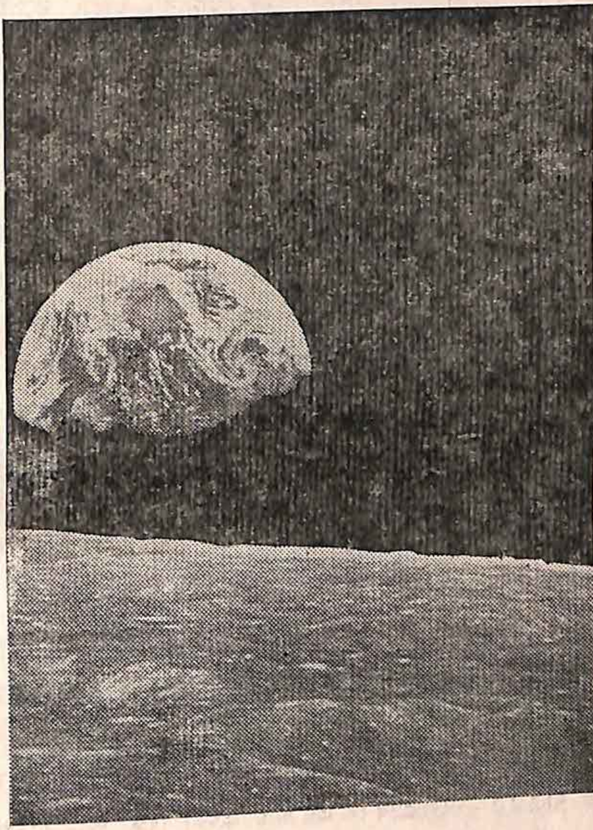
চাঁদের ওপর বায়ুমণ্ডল না থাকার দরুন সেখানের আকাশ যে কেমন হবে তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছো। হ্যাঁ, এর ফলে দিনের বেলাতেও চাঁদের আকাশ কুচকুচে কালো। আর শুধু তাই নয়, সেই কালো আকাশে দিনের বেলাতেও চক্‌মক্ করে অসংখ্য তারা।

আর একটা কথা আছে। পৃথিবীর আকাশে আমরা যেমন চাঁদকে দেখতে পাই, চাঁদের আকাশেও তেমনি পৃথিবীকে দেখা যায়। তবে তা দেখায় মস্ত একটা থালার মত, পূর্ণিমা চাঁদের চেয়ে প্রায় আড়াই গুণ বড়। শুধু তাই নয়। চাঁদের তুলনায় পৃথিবীর আলো প্রতিফলন ক্ষমতাও অনেক বেশী বলে চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে যে শুধু বড়ই দেখায় তা নয়, অনেক বেশী জ্বলজ্বলেও দেখায়। হিসেব করে দেখা গেছে যে চাঁদের আকাশে পৃথিবীর পুরো আলোকিত অংশটা যখন দেখা যায় তখন তার আলো পৃথিবীতে পূর্ণিমার চাঁদের আলোর তুলনায় প্রায় 30 গুণ বেশী।

আগে বলেছি, চাঁদের একটাই দিক পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে। এর ফলে বেশ একটা অদ্ভূত ব্যাপার হয়। চাঁদের আকাশে পৃথিবী উদয়ও হয় না, অস্তও যায় না। চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে স্থির মনে হয়। তবে আকাশের কোন জায়গায় তাকে দেখা যাবে তা নির্ভর করে চাঁদের কোন জায়গা থেকে তাকে দেখা হচ্ছে তার ওপর। চাঁদের যেখান থেকে পৃথিবীকে দিগন্তের ওপর দেখা যায় সেখান সেখান থেকে বরাবরই তাকে সেই জায়গাতেই দেখা যাবে। আবার যেখানে পৃথিবী থাকে মাথার ওপর সেখান থেকে বরাবরই তাকে মাথায় ওপরেই দেখা যাবে।

চাঁদের কলার মত চাঁদের আকাশেও পৃথিবীর কলা দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এখানে গোটা ব্যাপারটাই উল্‌টোভাবে ঘটে। পৃথিবীতে যখন পূর্ণিমা। (আমরা পূর্ণ-পৃথিবীও বলতে পারি); চাঁদে তখন অমাবস্যা। পৃথিবীতে যখন চন্দ্রগ্রহণ, চাঁদে তখন সূর্যগ্রহণ, পৃথিবীতে যখন সূর্যগ্রহণ, চাঁদে তখন দেখা যাবে 'পৃথিবী গ্রহণ'। অবশ্য এখানে পুরো পৃথিবীটাই অন্ধকার হয়ে যায় না, কেবলমাত্র চাঁদের ছায়াকে পৃথিবীর ওপর দিয়ে দ্রুত বেগে সরে যেতে দেখা যায়।

পৃথিবীতে সূর্যগ্রহণের সময় একটা জিনিস তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ—আকাশে সূর্য ও চাঁদের সাইজ একই মনে হয়। আসলে কিন্তু এটাও আমাদের



চাঁদের আকাশে পৃথিবী।

চোখের ভ্রম। আসলে সূর্যের ব্যাস চাঁদের ব্যাসের চেয়ে চারশো গুণ বেশী। তারা একই সাইজের দেখায়, কারণ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বও হলো পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের চারশো গুণ বেশী। অবশ্য চাঁদের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হওয়ার দরুন কখনও কখনও চাঁদের দূরত্ব একটু বেশী হয়ে পড়ে। সে সময় চাঁদকে সূর্যের চেয়ে একটু ছোট দেখায়। ঐ সময় যদি সূর্যগ্রহণ হয় তবে তা কেবল 'বলয় গ্রাস'ই হতে পারে।

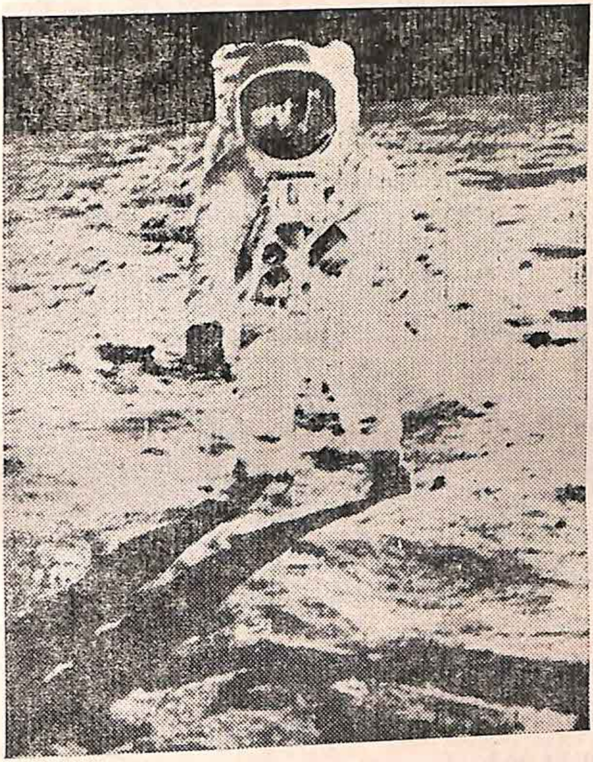
এখানে একটা কথা বলে রাখি। তোমরা জানো যে সূর্যগ্রহণ কেবলমাত্র পূর্ণিমাতেই। এখন প্রশ্ন হলো প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতেই গ্রহণ হয় না কেন? এর কারণ হলো এই যে চাঁদের কক্ষতল আর পৃথিবীর কক্ষতল এক সমতলে

নেই, আছে 5 ডিগ্রী কোনাকুনি ভাবে। এই কোনাকুনি থাকার ফলেই প্রতি পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য একই সরলরেখায় আসতে পারে না, সুতরাং গ্রহণও হয় না।

আগেই বলেছি, চাঁদ নিজের অক্ষে একবার পাক খায় $29\frac{1}{2}$ দিনে সুতরাং চাঁদের এক দিন হলো, পৃথিবীর প্রায় এক মাসের সমান। তার মধ্যে 'দিন' প্রায় 15 দিনের সমান, 'রাত' 15 দিনের সমান। বুঝতেই পারছ, ক্রমাগত 15 দিন সূর্যের প্রখর তেজে থাকার দরুণ চাঁদের ওপর দিনের বেলায় তাপমান খুব বেশী হবে। দেখা গেছে, চাদে যখন দুপুর সে সময় সেখানকার তাপমাত্রা 100 ডিগ্রী সেলসিয়াসেরও বেশী। মানে, তখন সেখানে ফুটন্ত জলের থেকেও বেশী গরম। আবার চাঁদের মাঝরাত্তিরে ঐ তাপমান নেমে আসে শূন্যেরও 116 ডিগ্রী নিচে। তাপমানের এত বেশী ওঠানামার কারণও হলো চাঁদের ওপর বায়ুমণ্ডলের অভাব।

চাঁদের ওপর বায়ুমণ্ডল কেন নেই এবার সে কথা তোমাদের বলি। আগেই বলেছি যে চাঁদের আয়তন পৃথিবীর 50 ভাগের এক ভাগ। এছাড়া ঘনত্বও পৃথিবীর তুলনায় কম। পৃথিবীর ঘনত্ব হলো 5·5, সে তুলনায় চাঁদের ঘনত্ব 3·3। সব মিলিয়ে চাঁদের ভর হলো পৃথিবীর তুলনায় 81 ভাগের এক ভাগ মাত্র। ভর কম হওয়ার দরুন চাঁদের মহাকর্ষ শক্তিও কম, পৃথিবীর অভিকর্ষের ছ'ভাগের এক ভাগ মাত্র। মানে, পৃথিবীতে যে মানুষের ওজন 90 কিলোগ্রাম, চাঁদে তার ওজন হবে মাত্র 15 কিলোগ্রাম। এর আর একটা দিক আছে। পৃথিবীর অভিকর্ষকে কাটিয়ে বেরোতে হলে রকেট ইত্যাদির গতি কমপক্ষে 11·2 কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে হওয়া অনিবার্য। কিন্তু চাঁদের টান কাটিয়ে বেরোবার জন্য 2.5 কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ড গতিবেগই যথেষ্ট। এত কম 'প্রস্থান বেগ' হওয়ার দরুনই চাঁদের নিজস্ব বায়ুমণ্ডলকে টেনে রাখবার ক্ষমতা নেই। যদি অতীতে কখনও চাঁদের বায়ুমণ্ডল থেকেও থাকে তা সহজেই মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে।

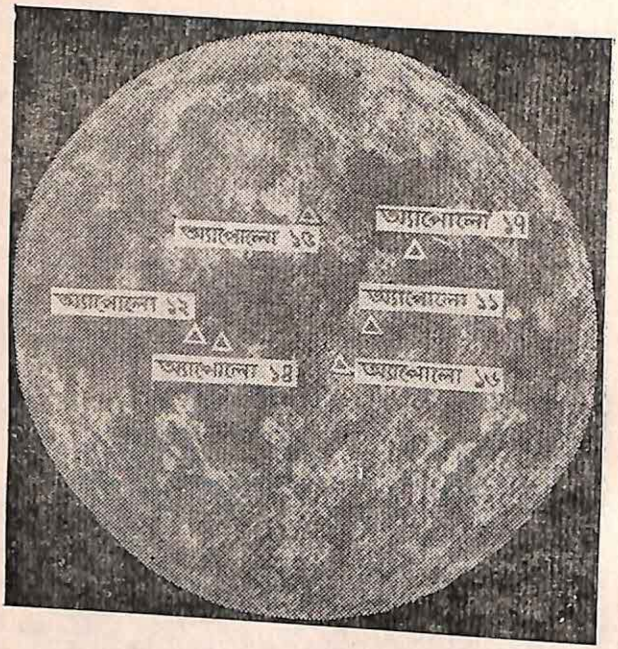
চাঁদ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে 1959 সালে। সে বছর অক্টোবর মাসে একটি সোভিয়েত মহাকাশযান, ল্যুনিক-3 (Lunik-3) চাঁদের পরিক্রমা করে তার উল্টোদিকের ছবি তুলে পাঠায়। ঐ সব ছবিতে দেখা যায় যে চাঁদের ঐ দিকটাও প্রায় সামনের দিকের মতই দেখতে এবড়ো খেবড়ো, গহ্বরে ভরা।



চাঁদের মাটিতে প্রথম মানুষ। নীল আর্মস্ট্রং এর তোলা এড্উইন অ্যালড্রিন-এর ছবি।

ল্যুনিক-3 এর পর এ পর্যন্ত সবে মিলিয়ে প্রায় 50 টি মহাকাশযান চাঁদ অভিমুখে পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল মানুষ ছাড়া অনুসন্ধানী যান, যেগুলি কাছ থেকে চাঁদের ছবি তুলে পাঠায়। কিছু আবার চাঁদের উপর নেমে সেখান থেকে ছবি ও অন্যান্য তথ্য পাঠায়। তারপর, 1969 সালে 21 শে জুলাই ঘটে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ঐ দিন পৃথিবীর মানুষ প্রথম চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করে।

মার্কিন চন্দ্রযান অ্যাপোলো-11 (Apollo-11) তে চড়ে সেদিন চাঁদের মাটিতে নেমেছিলেন দুজন মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং (Neil Armstrong) ও এড্ইন অ্যালড্রিন (Edwin Aldrin)। অ্যাপোলো 11-র পর আরও পাঁচটি অ্যাপোলো চন্দ্রযান মানুষ নিয়ে চাঁদের বুকে বিভিন্ন অঞ্চলে নামে। সব মিলে মোট 12 জন মহাকাশচারী চাঁদের মাটিতে নেমে সেখানে নানারকম বৈজ্ঞানিক



চাঁদের যে সব এলাকায় মানুষ নেমেছে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এসেছেন। তাঁরা ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন প্রচুর বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং চাঁদের মাটি ও পাথর। শেষের তিনটি অভিযানে (অ্যাপোলো 15, 16 এবং 17) আবার মহাকাশচারীদের চাঁদের ওপর চলাফেরার সুবিধার জন্য বিশেষ ধরনের ব্যাটারি-চালিত গাড়িও নিয়ে যাওয়া হয়।

ওদিকে আমেরিকা যখন চাঁদে মানুষ পাঠাতে ব্যস্ত, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মানুষ না পাঠিয়েই চাঁদ থেকে মাটি তুলে নিয়ে এসে বিজ্ঞানের অগ্রগতির এক নতুন দৃষ্টান্ত দিলেন। 1970 সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাদের বিশেষ ধরনের তৈরী ল্যুনা (Luna) চন্দ্রযান চাঁদের মাটিতে নেমে সেখানকার মাটি তুলে নিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে এলো। শুধু তাই নয়, এর পর 1970-এর নভেম্বরে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা চাঁদের ওপর মানুষ ছাড়া গাড়িও চালালেন, পৃথিবী থেকে সঞ্চালন করে।

এই সব অভিযানের ফলে চাঁদের গঠনের বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য আমরা পেয়েছি যা পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ করে কখনই জানা যেত না। আজ আমরা জানতে পেরেছি যে চাঁদের ভিতরের গঠনও অনেকটা পৃথিবীর মতই। চাঁদের

উপরিতলের নীচে 24 থেকে 64 কিলোমিটার পুরু মাটি এবং পাথরের স্তর আছে যা আমাদের ভূ-ত্বকের মত। চন্দ্র ত্বকের নীচে প্রায় 950 কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত আছে গরম ভারী পাথরের স্তর বা ম্যানটেল। এখানকার তাপমান প্রায় 1700 ডিগ্রী সেলসিয়াস। ম্যানটেলের নীচে চাঁদের কেন্দ্র পর্যন্ত আছে গলিত পাথরের স্তর বা 'কোর'। অবশ্য পৃথিবীর মত চাঁদের 'কোর' এ লোহা নেই। আর লোহা নেই বলেই চাঁদ হাল্কা। চাঁদের ঘনত্ব কম।

চাঁদের মাটি ও পাথর বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে সেগুলির রাসায়নিক গঠন পৃথিবীর মাটির মত নয়। যেমন ধরো, চাঁদের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, টাইটানিয়াম ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এগুলির মাত্রা পৃথিবীতে খুবই কম। আবার চাঁদে কার্বন, লোহা ইত্যাদির মাত্রা খুবই কম। চাঁদে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এটাও জানতে পারা গেছে যে অতীতে কোনও সময় চাঁদে প্রচুর অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে যার ফলে আজ সেখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লাভার স্তর দেখতে পাওয়া যায়।

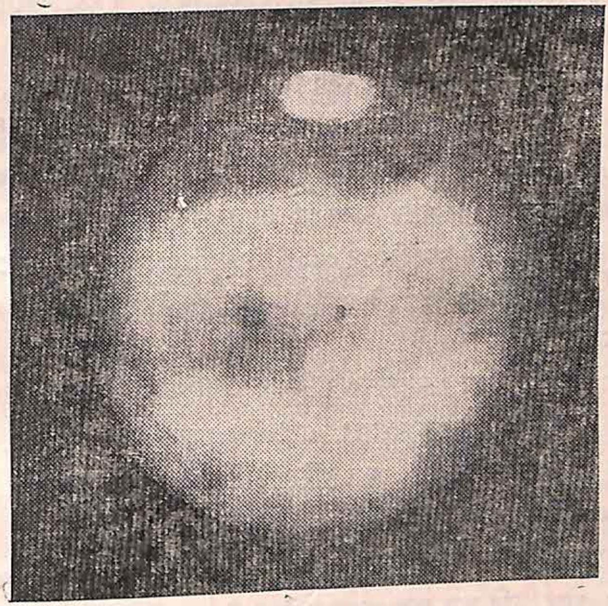
গত দশ বারো বছরে চাঁদের বিষয় অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু এখনও অনেক কিছু জানবার আছে। যেমন ধরো, আজও আমরা সঠিক জানি না যে আমাদের চাঁদ এলো কোথা থেকে। এ নিয়ে নানা মত আছে, তবে বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। হয়ত ভবিষ্যতে এ রহস্যের সমাধান পাওয়া যাবে।

লাল গ্রহ—মঙ্গল

সূর্য থেকে চতুর্থ গ্রহ মঙ্গল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে লাল রংএর এই গ্রহটি বড় বিতর্কমূলক গ্রহ। ঐ বিতর্ক হলো মঙ্গলে বুদ্ধিমান জীব আছে কিনা তা নিয়ে। গত প্রায় এক শতাব্দী ধরে মানুষের ধারণা ছিল যে মঙ্গলে সত্যিই বুদ্ধিমান জীবের বাস আছে, আর এই নিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনীও লেখা হয়েছে। এইচ. জি. ওয়েলসের (H. G. Wells) বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান কাহিনী 'দি ওয়ার অব দি ওয়ার্লডস্' তোমরা অনেকে নিশ্চয়ই পড়েছ। 1897 সালে লেখা এই বইটিতে ওয়েল্‌স্ মঙ্গলের কাল্পনিক বুদ্ধিমান অধিবাসীদের দ্বারা পৃথিবীর ওপর আক্রমণের এক রোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছেন যা সে সময় অনেকেই সত্যি বলে মনে করেছিলেন। আবার শুধু সাহিত্যেই নয় মঙ্গলগ্রহের ওপর জীবের অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞানী মহলেও নানা বিতর্ক চলেছে। এমন কি গত দশকে মঙ্গল-গ্রহ অভিমুখে যে সব গ্রহযান পাঠানো হয়েছে সেগুলিরও প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সেখানে জীবের সন্ধান করা। কিন্তু আজ আমরা জানতে পেরেছি যে মঙ্গলে বুদ্ধিমান জীব তো দূরের কথা কোনও রকম জীবাণুরও অস্তিত্ব নেই। তোমরা হয়ত প্রশ্ন করবে, তাহলে এরকম একটা ধারণা এলো কোথা থেকে? এর পেছনে আছে এক লম্বা কাহিনী।

গ্রহ হিসেবে মঙ্গল পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট। এর ব্যাস মাত্র 6798 কিলোমিটার, মানে পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় অর্ধেক। এর ভর পৃথিবীর ভরের মাত্র 10 ভাগের 1 ভাগ, অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের তুলনায় প্রায় 3 ভাগের 1 ভাগ। কিন্তু আয়তনে ছোট হলেও পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গলের অনেক ব্যাপারে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ, পৃথিবীর মত মঙ্গলও তার অক্ষতলে হেলে আছে আর দুইয়ের অক্ষের নতির পরিমাণও প্রায় একই। মঙ্গলের অক্ষ তার কক্ষতলে 25 ডিগ্রী হেলে আছে, সে তুলনায় পৃথিবীর অক্ষ হেলে আছে $23\frac{1}{2}$ ডিগ্রী। এর ফলে মঙ্গলেও পৃথিবীর মত বার্ষিক ঋতুচক্র আছে। অবশ্য যেহেতু মঙ্গলের দূরত্ব সূর্য থেকে পৃথিবীর চেয়ে বেশী, সেজন্য সূর্যের চারপাশে একপাক ঘুরতে মঙ্গলের লাগে প্রায় 687 দিন। সুতরাং মঙ্গলের বিভিন্ন ঋতুর স্থিতিকালও পৃথিবীই তুলনায় বেশী।

আরও একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য হলো আহ্নিক গতির বেলায়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে পৃথিবীর নিজের অক্ষে একবার পাক খায় 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4 সেকেণ্ডে। সে তুলনায় মঙ্গল নিজের অক্ষে একবার ঘোরে 24 ঘণ্টা 37 মিনিট



পৃথিবী থেকে তোলা মঙ্গলের ছবি। ওপরের সাদা অংশটা হলো মঙ্গলের টুপি।

23 সেকেণ্ডে; মানে দুটি গ্রহের দিনের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান। এছাড়া পৃথিবীর মত মঙ্গলেরও নিজস্ব বায়ুমণ্ডল আছে, যদিও তা পৃথিবীর তুলনায় খুবই হাল্কা।

মঙ্গলের বিষয় এই সব তথ্য অনেক দিন আগেই বিজ্ঞানীরা জানতে পেরে-ছিলেন দূরবীন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। তাঁরা আরও জানতে পেরেছিলেন যে পৃথিবীর বরফে ঢাকা মেরু অঞ্চলের মত মঙ্গলের দুই মেরুতেও সাদা টুপির মত এলাকা আছে যা ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে আয়তনে বাড়ে কমে। এছাড়া মঙ্গলের গায়ে গাঢ় ছোপের মত দাগও তাঁদের চোখে পড়েছিল যার গতি থেকেই মঙ্গলের আহ্নিক গতির সঠিক সময় নির্ধারণ তাঁরা করতে পেরেছিলেন। মোট কথা গত তাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত দূরবীনের সাহায্যে মঙ্গলের বিষয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু তখনও কারও মনে মঙ্গলে জীবনের সম্ভাবনার কথা আসেনি। সে ঘটনা ঘটে আরও পরে।

সৌরমণ্ডলে পৃথিবীর পরবর্তী গ্রহ হওয়ার দরুণ মঙ্গল গ্রহ কখনও কখনও

পৃথিবীর খুবই কাছে এসে পড়ে। দেখা গেছে যে প্রতি 15 থেকে 17 বছর পর পর একবার মঙ্গল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে, মানে প্রায় 5 কোটি 60 লক্ষ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে চলে আসে। সে সময় যে কোনও মাঝারি সাইজের দূরবীনেও মঙ্গলকে দেখায় পূর্ণিমার চাঁদের মত বড়। ঐ সময় মঙ্গলের অনেক বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়ে।

1877 সালের আগস্ট মাসেও মঙ্গল ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। ঐ সময় দূরবীন দিয়ে মঙ্গলকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে এক অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলেন ইতালীয় বিজ্ঞানী গিওভানি সিয়াপারেলি (Giovanni Schiaparelli)। তাঁর চোখে পড়ল মঙ্গলের গায়ে মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম রেখা। সরল রেখার মত ঐ দাগগুলির তিনি নাম দিলেন canali ইতালীয় ভাষায় যার মানে হলো 'খাঁজ'। কিন্তু পরবর্তী কালে ঐ canali-কেই বিজ্ঞানীরা ভুল করে canal বা খাল বলেই ধরে নিলেন।

এর পর 1894 সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী পার্সিভাল লোয়েল (Percival Lowell) বললেন, যেহেতু মঙ্গলের 'খাল'গুলির গঠন সরল রেখার মত, সেগুলি নিশ্চয়ই কৃত্রিম ভাবে তৈরী। আর যদি সত্যিই তাই হয় তবে মঙ্গলে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান জীব আছে।

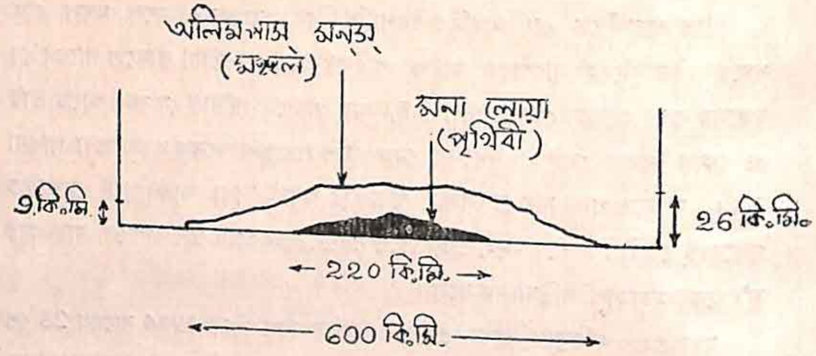
লোয়েলের এরকম ধারণার আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। তা হলো মঙ্গলের মেরুর টুপি আর তার গায়ের পরিবর্তনশীল গাঢ় ছোপ। আগেই বলেছি মেরু টুপির আয়তন ঋতু হিসাবে বাড়ে কমে। লোয়েল দেখলেন মঙ্গলের গায়ের গাঢ় ছোপও ঋতুতে ঋতুতে পালটে যায়। আর এই পাল্‌টে যাওয়ারও একটা নির্দিষ্ট চক্র আছে। লোয়েল এ সব ঘটনার একটা খুব সরল ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন যে গ্রীষ্মকালে মঙ্গলের মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ার ফলেই মেরু টুপির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। আর মেরু অঞ্চল থেকে বিষুব অঞ্চলে জল নিয়ে যাওয়ার জন্যই মঙ্গলের অধিবাসীরা গ্রহব্যাপী ঐ সব কৃত্রিম খাল তৈরী করেছে। লোয়েল আরও বললেন যে মঙ্গলের গায়ের ঐ গাঢ় ছোপ আসলে হলো উদ্ভিদ ঢাকা এলাকা যা ঋতু পরিবর্তনের সাথে বদলায়। সবে মিলে লোয়েল মঙ্গলের জগৎটাকে প্রায় পৃথিবীর অনুরূপ বলেই মেনে নিয়েছিলেন আর সেই সঙ্গে জন্মেছিল মানুষের মনে মঙ্গল গ্রহে জীবের বিভ্রান্তিকর ধারণা। লোয়েলের ব্যাখ্যায় যে সত্যিই কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল তা নয়। এ ছিল সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক। কিন্তু হলে কি হবে, যেহেতু লোয়েল ছিলেন একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, তাঁর ভুল ধারণাকেও সাধারণ মানুষ সত্যি মেনে নিয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীতে এসে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে পর্যবেক্ষণের ফলে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণারও অনেক পরিবর্তন হয়। তাঁরা জানতে পারেন যে মঙ্গলের ওপর আসলে কোনও খাল নেই, আর সেখানে সত্যিই যে জল আছে তার ও কোন প্রমাণ নেই। মঙ্গলের মেরু টুপি সম্বন্ধেও অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যায়। জানতে পারা যায় যে সেগুলি প্রধানতঃ জমাট বাঁধা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসেরই তৈরী। তবে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায় গত দু'দশকের মহাকাশ অভিযানের ফলে।

মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে প্রথম গ্রহযান পাঠানো হয়েছিল 1964 সালের 28 শে নভেম্বর। মেরিনার-4 (Mariner-4) নামক গ্রহযানটি প্রায় সাড়ে সাত মাস পরে, 1965 সালের 14-ই জুলাই মঙ্গলগ্রহের 9,800 কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। সে সময় পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব ছিল 21 কোটি 60 লক্ষ কিলোমিটার। এর চার বছর পর পাঠানো হয় আরও দুটি মেরিনার গ্রহযান। মেরিনার-6 ছাড়া হয় 24 ফেব্রুয়ারী 1969 তারিখে, মেরিসার-7 কে ছাড়া হয় 26 মার্চ 1969 তারিখে। দুটি গ্রহযানই মঙ্গলগ্রহের প্রায় 3500 কিলোমিটর দূর দিয়ে বেরিয়ে যায়, মেরিনার-6 31 জুলাই তারিখে আর মেরিনার-7 5 আগস্ট 1969 তারিখে। তিনটি গ্রহযান থেকেই মঙ্গল গ্রহের উপরিতলের অনেক ছবি পাওয়া যায়। সেগুলিতে দেখা যায় যে মঙ্গলের উপরিতলও চাঁদের মত অসংখ্য গহ্বরে ভরা। মেরিনার-7 মঙ্গলের মেরুটুপির বিষয়েও অনেক নতুন তথ্য পাঠায়।

এর পর 1971 সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা 'মারস্-2 (Mars 2) এবং মারস্-3 নামক দুটি গ্রহযান মঙ্গল অভিমুখে পাঠায়। দুটি গ্রহযানই প্রথমে মঙ্গলের কক্ষে পৌঁছে সেখান থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় এবং পরে অবতরণ যান নামায়। কিন্তু দুটি অবতরণ যানই নামবার সময় নষ্ট হয়ে যায়।

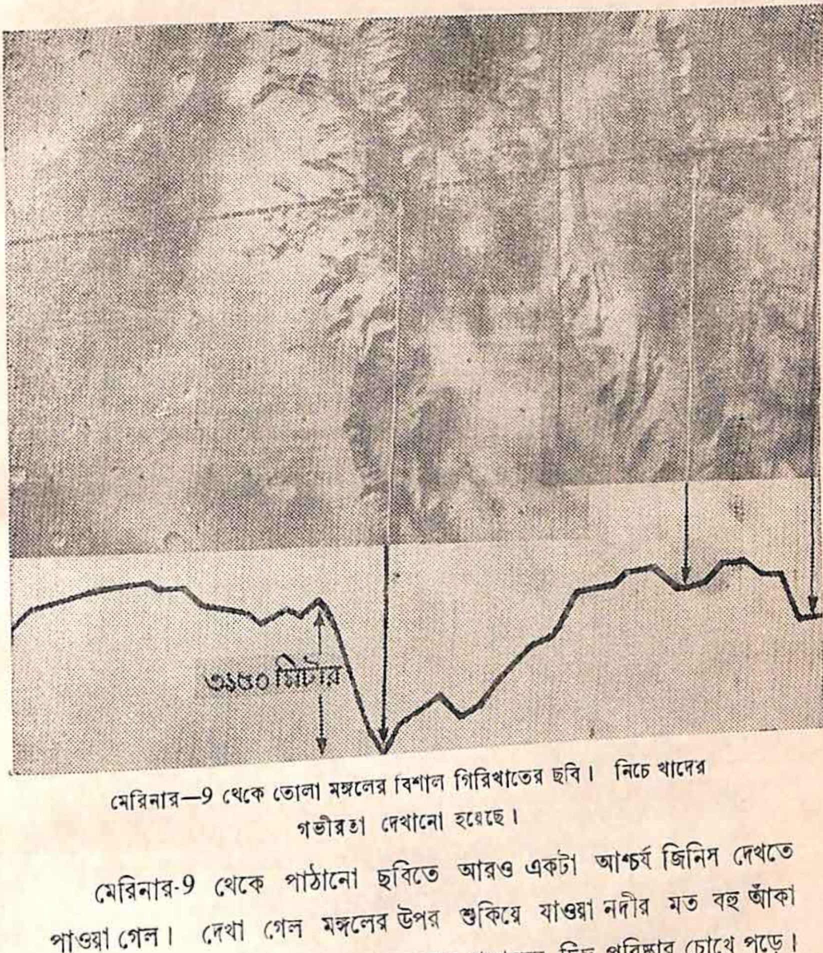
1971 সালেই মঙ্গল অভিমুখে আরও দুটি মেরিনার গ্রহযান ছাড়া হয়। এদের মধ্যে প্রথমটি, মেরিনার-8, ছাড়বার সময়েই সমুদ্রে পড়ে যায়। অপরটি, মেরিনার-9, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি মঙ্গলের কাছে গিয়ে পৌছয়। মঙ্গলে তখন বড়ো রকমের একটা ধুলিঝড় চলছিল যা প্রায় গোটা গ্রহটাকেই ঢেকে ফেলেছিল। বিজ্ঞানীদের কাছে এ ছিল এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। মঙ্গলের ওপর ধুলিঝড়ের হদিস তাঁরা এর আগেও পেয়েছিলেন, কিন্তু তা যে এত ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে তা ছিল তাঁদের কল্পনার বাইরে। সে ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় 500 কিলোমিটার।



মঙ্গল ও পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয়গিরির তুলনামূলক আকার।

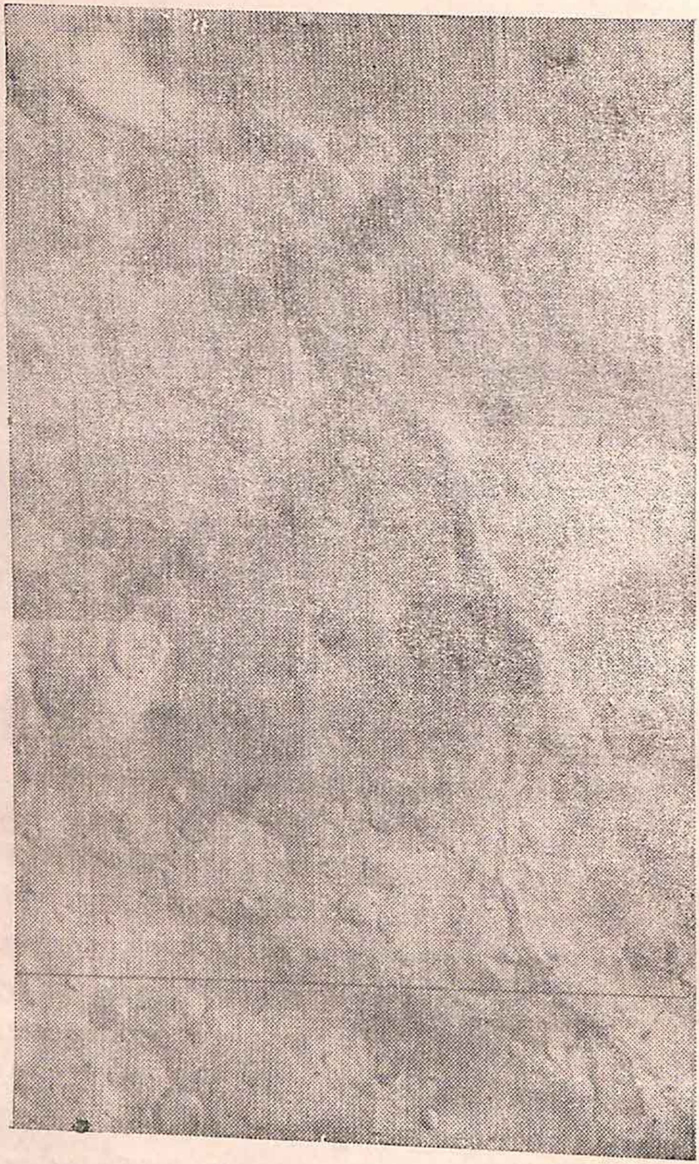
অবশেষে 1972 সালের গোড়ার দিকে মঙ্গলের সেই গ্রহব্যাপী ঝড় থামলো। মেরিনার-9 তখন মঙ্গলের চারপাশে কক্ষপথে পরিক্রমা করে চলেছে। ধূলিঝড় থেমে যাওয়ার পর মেরিনার-9 এর ক্যামেরার চোখে ধরা পড়লো মঙ্গলের এক নতুন রূপ। গ্রহযানটি থেকে পাঠানো ছবিতে দেখা গেল মঙ্গলে আছে বিশাল বিশাল আগ্নেয়গিরি এবং গভীর গিরিখাত যার নজীর আমাদের পৃথিবীতে নেই। মঙ্গলের সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি হলো 'অলিম্পাস্ মন্স্' (**Olympus Mons**)। এর ব্যাস প্রায় 600 কিলোমিটার আর উচ্চতা অন্ততপক্ষে 26 কিলোমিটার। সে তুলনায় আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো আগ্নেয়গিরি হাওয়াই দ্বীপের মনা লোয়ার (Mauna Loa) ব্যাস হলো 200 কিলোমিটার আর উচ্চতা মাত্র 9 কিলোমিটার (এখানে অবশ্য উচ্চতা বলতে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ থেকে নিয়ে চূড়োর উচ্চতার কথা বলছি)। বিজ্ঞানীদের মতে অলিম্পাস্ মন্স্ হলো সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি।

গিরিখাতের বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার। পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের গিরিখাতগুলি অতি বিশাল এবং গভীর। পৃথিবীর উপর সবচেয়ে বড় গিরিখাত হলো আমেরিকার 'গ্রাণ্ড-ক্যানিঅ্যান' (Grand Canyon)। এর দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে চারশ কিলোমিটার, সবচেয়ে বেশী গভীরতা প্রায় 1800 মিটার আর প্রস্থ কোথাও 19 কিলোমিটারের বেশী নয়। সে তুলনায় মঙ্গলের সবচেয়ে বড় গিরিখাতের দৈর্ঘ্য প্রায় 3,700 কিলোমিটার, গভীরতা প্রায় 6500 মিটার আর প্রস্থ 240 কিলোমিটার। কি অতিকায় সে গিরিখাত তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছ।



মেরিনার—9 থেকে তোলা মঙ্গলের বিশাল গিরিখাতের ছবি। নিচে খাদের গভীরতা দেখানো হয়েছে।

মেরিনার-9 থেকে পাঠানো ছবিতে আরও একটা আশ্চর্য জিনিস দেখতে পাওয়া গেল। দেখা গেল মঙ্গলের উপর শুকিয়ে যাওয়া নদীর মত বহু আঁকা বাঁকা রেখা যাতে অতীতে কোনও সময়ে জল প্রবাহের চিহ্ন পরিষ্কার চোখে পড়ে। ঐ সব দেখে বিজ্ঞানীরা মনে করেন মঙ্গল গ্রহে অতীতে কোনও সময় নিশ্চয়ই প্রচুর জল ছিল। মেরিনার-9 থেকে পাঠানো তথ্য থেকে আরও জানতে পারা গেল যে মঙ্গলের মেরু অঞ্চলের সাদা টুপি বেশীর ভাগটাই জমাট বাঁধা কার্বন ডাই অক্সাইড হলেও তাতে কিছুটা জলের বরফও আছে। বিজ্ঞানীদের মতে মঙ্গলের গ্রীষ্মকালে মেরু টুপির কার্বন ডাই অক্সাইড উবে গিয়ে শুধু মাত্র এক কিলোমিটার পুরু জলের বরফের স্তর রয়ে যায় যা মঙ্গলের ঠাণ্ডায় কখনই গলতে পারে না।



মঙ্গলের ওপর শুকিয়ে যাওয়া নদীর মত আঁকাবাঁকা রেখা।

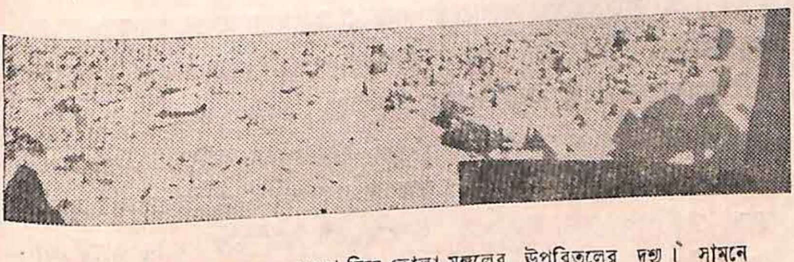
মেরিনার—9 থেকে মঙ্গলের গাঢ় ছোপেরও ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। দেখা গেল ঝড়ে উড়ে যাওয়া বালির আস্তরণের রদবদলের দরুনই ওটা হয়। গ্রহযানটি

থেকে পর্যবেক্ষণের সময় এমনি ধুলো উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা পর পর তোলা ছবিতে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। দেখা গেছে প্রথমে যা ছিল ছোট একটা গাঢ় ছোপ, পরে ধুলো উড়ে গিয়ে নিচের মাটি বেরিয়ে পড়ার ফলে সেটাই বড়ো হয়ে উঠেছে। এখানে কোনও উদ্ভিদও নেই জলও নেই।

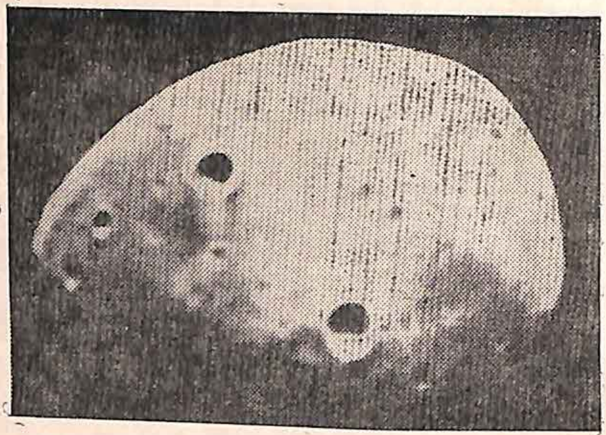
মেরিনার—9 এর পর 1973 সালে তিনটি 'মারস্' গ্রহযান মঙ্গলে পাঠানো হয়। এদের মধ্যে দুটি, 'মারস্'-4 এবং মার্স্-5 মঙ্গলের কক্ষ থেকে ছবি এবং অন্যান্য তথ্য পাঠায়। মার্স্-6 গ্রহযানটি মঙ্গলের ওপর নামতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

এরপর 1975 সালে পাঠানো হয় দুটি ভাইকিং গ্রহযান মঙ্গলে জীবের সন্ধান করতে। ভাইকিং—1 মঙ্গলের ওপর গিয়ে নামে 20 জুলাই 1976 তারিখে আর ভাইকিং—2 নামে আরও 7400 কিলোমিটার দূরে গিয়ে 3 সেপটেম্বর 1976 তারিখে। দুটি গ্রহযানেই মঙ্গলের উপরিতলের মাটি খুঁড়ে তাতে কোনও জৈব বিক্রিয়ার লক্ষণ আছে কিনা তার অধ্যায়ন করবার জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি ছিল। কিন্তু অনেক রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পরও মঙ্গলের মাটিতে জীবনের কোনও লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যায় নি।

অবশ্য ভাইকিং থেকে পাঠানো ছবি এবং তথ্য বিশ্লেষণ করে মঙ্গলের বিষয়ে অনেক কিছু নতুন জানতে পারা গেছে। জানতে পারা গেছে যে মঙ্গলের উপরিতল হলো পাথরভরা লাল মরুভূমির মত, সেখানকার আকাশ হালকা লালচে মেঘহীন। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল খুবই হাল্কা, সেখানের বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের একশো ভাগের মাত্র এক ভাগ। তাতে আছে শতকরা 95 ভাগ কার্বন ডাই অক্সাইড, 2·5 ভাগ নাইট্রোজেন, 1·5 ভাগ আর্গন গ্যাস, 0·1 ভাগ অক্সিজেন এবং সামান্য পরিমাণে জলীয় বাষ্প, হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন গ্যাস।



ভাইকিং-এর বিশেষ ধরণের ক্যামেরা দিয়ে তোলা মঙ্গলের উপরিতলের দৃশ্য। সামনে পাথর ছড়ানো মরুভূমি দেখা যাচ্ছে।



মঙ্গলের উপগ্রহ ডাইমোস।

সূর্য থেকে দূরে হওয়ার দরুন মঙ্গলের ওপর তাপমান যে কম হবে তা নিশ্চয়ই তোমরা আন্দাজ করতে পেরেছ। দেখা গেছে সেখানে তাপমান শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে প্রায় ওঠেই না। ভাইকিং গ্রহযান যেখানে নেমেছিল সেখানের তাপমাত্রা ছিল দিনে মাইনাস 30 ডিগ্রী এবং রাত্রে মাইনাস 85 ডিগ্রী। মেরিনার থেকে মাপজোক নিয়ে দেখা গেছে যে মেরু অঞ্চলের তাপমান মাইনাস 125 ডিগ্রী পর্যন্ত নেমে যায়। অবশ্য গ্রীষ্মকালে বিষুব অঞ্চলে দিনের তাপমান 18 ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠতেও দেখা গেছে।

মঙ্গলের মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে পৃথিবীর মাটির সঙ্গে তার অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে পৃথিবীর মাটির তুলনায় মঙ্গলের মাটিতে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক বেশী। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে লোহা জাতীয় অক্সাইড থাকার দরুনই মঙ্গলের মাটি মরচের মত লাল। এক্সরে দিয়ে মাটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তাতে আছে লোহা, ক্যাল্সিয়াম, অ্যালুমিনিয়ম, সিলিকন এবং গন্ধক। সেখানের পাথরের গঠন অনেকটা আগ্নেয়-গিরির লাভা জমাট বেঁধে তৈরী ব্যাসাল্টের মত।

মঙ্গলের উপগ্রহ দুটি। নাম ফোবোস (Phobos) এবং ডাইমোস (Deimos)। উপগ্রহ দুটি এত ছোট আর সেগুলির কক্ষপথ এত কাছে যে শক্তিশালী দূরবীন ছাড়া সেগুলিকে দেখা যায় না। উপগ্রহ দুটি আবিষ্কার করেন আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী আসাফ্ হল (Asaph Hall), 1877 সালে। দুটি উপগ্রহই

হলো এবড়ো খেবড়ো পাথরের টুকরোর মত দেখতে। ফোবোস 22 কিলোমিটার লম্বা 16 কিলোমিটার চওড়া, ডাইমোস 11 কিলোমিটার লম্বা 9 কিলোমিটার চওড়া। মঙ্গল থেকে ফোবোসের দূরত্ব মাত্র 6000 কিলোমিটার, মঙ্গলের এক পাক খেতে তার সময় লাগে মাত্র 7 ঘণ্টা 39 মিনিট। এত দ্রুত ঘোরে বলে মঙ্গলের উপর থেকে ফোবোসকে পশ্চিম দিকে উঠতে আর পূব দিকে অস্ত যেতে দেখা যায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই যে মঙ্গলের একদিনে ফোবোস দুবার উদয় হয় আর দুবার অস্ত যায়। উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত ফোবোস আকাশে থাকে মাত্র $5\frac{1}{3}$ ঘণ্টা।

ডাইমোসের কক্ষপথ অনেক বেশী বড়। মঙ্গল থেকে ডাইমোসের দূরত্ব প্রায় 19,300 কিলোমিটার। মঙ্গলের কক্ষপথে একবার ঘুরতে ডাইমোসের সময় লাগে 30 ঘণ্টা 18 মিনিট। মানে মঙ্গলের আকাশে পূর্বে উদয় হয়ে পশ্চিমে অস্ত যেতে ডাইমোসের সময় লাগে প্রায় $2\frac{1}{3}$ দিন। এই দুটো উপগ্রহেরই দূরত্ব এত কম যে মঙ্গলের মেরু অঞ্চল থেকে এদের কোনটিকেই দেখতে পাওয়া যায় না, এ গুলি সব সময়েই দিগন্তের নিচে থাকে।

গ্রহের রাজা বৃহস্পতি

সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি। অতিকায় এই গ্রহটি এত বিশাল যে এর মধ্যে 1300টা পৃথিবী অনায়াসে ধরে যেতে পারে। সৌরমণ্ডলের বাকি আটটি গ্রহ এবং সব কটি উপগ্রহকে যদি একসঙ্গে জড়ো করা যায় তবে তাদের সমষ্টিগত আয়তনও বৃহস্পতির আয়তনের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ হবে! আর একা বৃহস্পতির ভর হলো বাকি সব কটি গ্রহ-উপগ্রহের সমষ্টিগত ভরের প্রায় আড়াই গুণ। বৃহস্পতির উপগ্রহের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। আজ পর্যন্ত এর 14টি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া গ্রহযান পাঠিয়ে আরও একটা নতুন খবর পাওয়া গেছে। জানতে পারা গেছে যে, শনির মত বৃহস্পতির রিং বা বলয় আছে, যদিও তা খুবই ক্ষীণ।

সূর্য থেকে দূরত্ব হিসেবে বৃহস্পতি হলো পঞ্চম গ্রহ। তবে এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। তোমরা জানো যে, সূর্য থেকে চতুর্থ গ্রহ মঙ্গলের দূরত্ব হলো 22 কোটি 79 লক্ষ কিলোমিটার। সে তুলনায় বৃহস্পতির দূরত্ব 77 কোটি 90 লক্ষ কিলোমিটার। মানে, মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানে প্রায় 55 কোটি কিলোমিটার এলাকায় আর কোনও গ্রহ নেই। ব্যাপারটা বহুকাল থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে একটু অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। কেপলার থেকে শুরু করে অনেকেরই ধারণা ছিল যে, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে নিশ্চয়ই কোনও গ্রহ আছে যার সন্ধান তারা পাননি। এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হলো 1772 সালে বিখ্যাত বোডের সূত্র (Bode's Law) প্রকাশিত হওয়ার পর। ঐ সূত্র অনুসারে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে, সূর্য থেকে প্রায় 42 কোটি কিলোমিটার দূরে আরও একটা গ্রহ থাকা উচিত। আজ অবশ্য আমরা জানতে পেরেছি যে, বোডের সূত্র অনুসারে যেখানে পঞ্চম গ্রহটি থাকার কথা সেখানে কোনও আস্ত গ্রহ নেই, বরং আছে অসংখ্য টুকরো টুকরো বস্তুপিণ্ড, যেগুলো গ্রহের মতই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। হয়তো অতীতে কোনও সময় আস্ত একটি গ্রহই ছিল যা, যে কোনও কারণেই হোক, ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে আর সে জায়গায় রয়ে গেছে ছোট বড় নানা আকারের অসংখ্য গ্রহের টুকরো। এরকম একটা কিছু ভেবেই বিজ্ঞানীরা ঐ বস্তুপিণ্ডগুলির নাম দিয়েছেন গ্রহাণুপুঞ্জ বা

asteroids। আজ পর্যন্ত প্রায় 2000 গ্রহাণুপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে এক লক্ষেরও বেশি গ্রহাণু আছে। গ্রহাণুদের কথা পরে আরও বলবো। এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো গ্রহ। সুতরাং বৃহস্পতির কথায় ফিরে আসা যাক্।

আগেই বলেছি বৃহস্পতি হলো এক অতিকায় গ্রহ। এর ব্যাস 1 লক্ষ 42 হাজার আটশো কিলোমিটার। সে তুলনায় আমাদের পৃথিবীর ব্যাস 13 হাজার কিলোমিটারেরও কম। কিন্তু আয়তনে বড় হলে কি হবে, বৃহস্পতি খুবই হাল্কা গ্রহ। এর গড় ঘনত্ব হলো পৃথিবীর ঘনত্বের 4 ভাগের এক ভাগ মাত্র। সেজন্য আয়তনে প্রায় 1300 গুণ বড় হলেও বৃহস্পতির ভর হলো পৃথিবীর তুলনায় মাত্র 318 গুণ বেশি।

এমনটি হওয়ার প্রধান কারণ হলো বৃহস্পতির গঠন। পৃথিবী, মঙ্গল, শুক্র ও বুধ হলো মাটিপাথরের তৈরী গ্রহ। সেজন্য এদের ঘনত্ব বেশি। কিন্তু বৃহস্পতি (এবং শনি) প্রধানতঃ হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, মিথেন এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসের তৈরী। তাই এদের ঘনত্ব খুবই কম।

গত কয়েক বছরে গ্রহযান পাঠিয়ে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, বৃহস্পতির ভেতরটা কোনও কঠিন বস্তু দিয়ে তৈরী নয় এবং গ্রহটির উপরিতল বলতে কিছুই নেই। কেবল কেন্দ্রের কাছাকাছি কিছুটা অংশ ছাড়া বাকি প্রায় সমস্ত গ্রহটাই তরল হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরী।

সূর্য থেকে দূরে হওয়ার দরুন কক্ষপথে একবার পরিক্রমা করতে বৃহস্পতির সময় লাগে প্রায় 12 বছর। কক্ষপথে চলতে চলতে প্রতি 399 দিন পরে পরে বৃহস্পতি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসে পড়ে। তখন তাদের মধ্যে দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় 59 কোটি 10 লক্ষ কিলোমিটার। এ সময় প্রায় সারা রাত ধরেই বৃহস্পতিকে আকাশে দেখতে পাওয়া যায় আর দূরবীন দিয়ে দেখার এই হলো সবচেয়ে ভালো সময়। বৃহস্পতি যখন পৃথিবী থেকে সব চেয়ে দূরে চলে যায় তখন তাদের মধ্যে দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় 96 কোটি 60 লক্ষ কিলোমিটার।

বিশালকায় হওয়ার দরুন রাতের আকাশে বৃহস্পতিকে খুবই উজ্জ্বল দেখায়। তবে যে কোনও শক্তিশালী দূরবীনে তার আসল রূপটা চোখে পড়ে—লাল, হলদে, খয়েরী ডোরাকাটা চাকতির মত। ঐ ডোরা দাগগুলি কিন্তু স্থির নয়, ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। ঐ দাগগুলির গতি পর্যবেক্ষণ করেই জানতে পারা যায় যে, বৃহস্পতির নিজের অক্ষে ঘোরার গতি খুবই দ্রুত। অত বিশাল হওয়া সত্ত্বেও



বৃহস্পতির বিরাট 'লাল ছোপ' বাঁ পাশে দেখা যাচ্ছে।

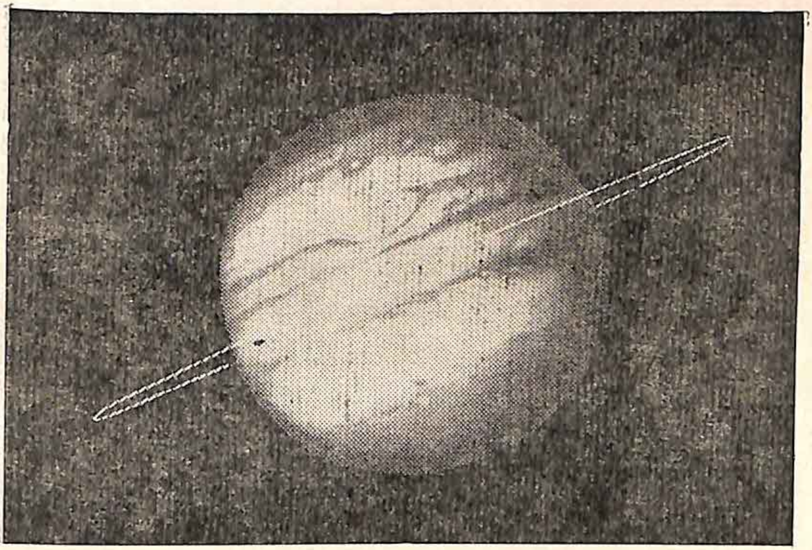
নিজের অক্ষে একবার ঘুরতে বৃহস্পতির সময় লাগে মাত্র 9 ঘণ্টা 50 মিনিট.। আবার ঐ গতিও কিন্তু সব জায়গায় এক নয়। দেখা গেছে যে, বৃহস্পতির মেরু অঞ্চল তার বিষুব অঞ্চলের চেয়ে আস্তে ঘুরছে। সেখানে সময় লাগে প্রায় 9 ঘণ্টা 56 মিনিট। বুঝতেই পারছ, বৃহস্পতির গঠন যদি কঠিন হত, তা হলে এমন হওয়া সম্ভব হত না। তার ভেতরটা তরল অবস্থায় আছে বলেই এটা হতে পারে।

বিশাল ঐ গোলকটির অত দ্রুতবেগে ঘোরার একটা ফল হলো এই যে, অপকেন্দ্র বলের দরুন বৃহস্পতির বিষুবীয় অঞ্চল তার মেরু অঞ্চলের তুলনায় অনেকটা ফোলা। দেখা গেছে, গ্রহটির বিষুবীয় ব্যাস তার ধ্রুবীয় ব্যাসের চেয়ে প্রায় 8800 কিলোমিটার বেশি। এজন্য দূরবীনে বৃহস্পতির চাকতিটিকে পুরো গোলাকার দেখায় না, দেখায় ওপরে-নিচে খানিকটা চাপা উপবৃত্তের মত।

নানা রং-এর ডোরা ছাড়া দূরবীনে বৃহস্পতির যে জিনিসটা সহজেই চোখে পড়ে তা হলো এক বিরাট লাল ছোপ। প্রায় 40,000 কিলোমিটার লম্বা ডিমের মত আকারের গাঢ় লাল রং-এর ছোপটিকে দেখা যায় গ্রহটির দক্ষিণ গোলার্ধে 20 ডিগ্রী অক্ষাংশ বরাবর। অবশ্য ছোপটির রং সব সময়ে এক থাকে না। কখনও

তাকে গাঢ় লাল রং-এর দেখায়, আবার কয়েক বছরের মধ্যে সেটা ফিকে হয়ে হাল্কা গোলাপী বর্ণ ধারণ করে। পরে আবার সেটা লাল হয়ে যায়।

বহুদিন ধরেই বৃহস্পতির লাল ছোপ নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে নানারকম ধারণা ছিল। কেউ মনে করতেন যে, ছোপটি আসলে হলো বৃহস্পতির উপরিতলেরই



বৃহস্পতির রিং বা বলয়।

অংশ যা মেঘের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়। কারো বা ধারণা ছিল যে, ছোপটি হলো বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলেরই কোনও স্থায়ী অংশ, আবার কেউ ভাবতেন ওটা হলো বৃহস্পতির ঘন বায়ুমণ্ডলের ওপর ভাসমান কোনও বস্তুর স্তর।

সাম্প্রতিককালে পায়োনিয়ার (Pioneer) এবং ভয়েজার (Voyager) গ্রহযান থেকে পাঠানো ছবি ও তথ্য অবশ্য এসব ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত করেছে। আজ আমরা জানতে পেরেছি যে, লাল ছোপটি আসলে হলো বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরের বিশাল ঘূর্ণীঝড় অধ্যুষিত এলাকা। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বৃহস্পতির দক্ষিণ গোলার্ধের ঐ প্রচণ্ড ঘূর্ণীঝড় শত শত বছর ধরে চলে আসছে আর হয়তো আরও হাজার হাজার বছর ধরে এমনভাবেই চলবে।

1972 সালে বৃহস্পতির উত্তর গোলার্ধেও একটা ছোট লাল ছোপ দেখতে পাওয়া যায়। 1973 সালে যখন পায়োনিয়ার-10 গ্রহযানটি বৃহস্পতির কাছাকাছি পৌছয় তখন ছোপটির ছবিও তোলা হয়। কিন্তু পরের বছর যখন পায়োনিয়ার-11

বৃহস্পতির পাশ কাটিয়ে যায়, তখন আর সে ছোপটিকে দেখতে পাওয়া যায় নি।

বৃহস্পতির গায়ে ছোপের লাল রং হওয়ার একটা ব্যাখ্যাও বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। তাঁদের ধারণা, ওটা হয় ঘূর্ণীঝড়ের দরুন নিচেকার বায়ুমণ্ডল থেকে ফসফোরাস এবং গন্ধকের যৌগের ওপরের বায়ুমণ্ডলে উঠে আসায়।



বৃহস্পতির উপগ্রহ 'আইও'র ওপর অগ্ন্যুৎপাত।

আগেই বলেছি যে, বৃহস্পতির উপরিতল বলে কিছুই নেই। দূরবীনে ডোরাকাটা যে দাগ বৃহস্পতির গায়ে দেখতে পাওয়া যায় তা হলো তার বায়ুমণ্ডলে মেঘের বিভিন্ন স্তর, যা বিষুবরেখার সমান্তরালে বিভিন্ন বেগে ঘুরে চলেছে। ঐ

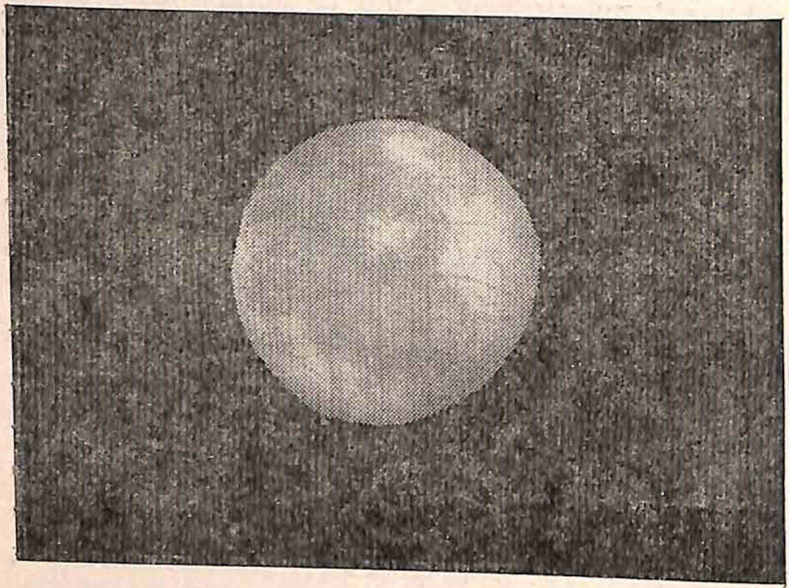
মেঘের স্তরেও চোখে পড়ে নানারকম ফুট ফুট দাগ যা ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। এত সব অদল-বদল ও ওলট-পালোট থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, বৃহস্পতির ভেতরকার বায়ুমণ্ডলে সব সময়েই প্রচণ্ড আলোড়ন হয়ে চলেছে আর তারই ফলে বায়ুমণ্ডলের বাইরের চেহারাও ক্রমাগত বদলাচ্ছে।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল কত গভীর তা সঠিকভাবে আজও জানতে পারা যায় নি। তবে অনুমান করা হয়, সেটা হয়তো 1000 কিলোমিটারের বেশি নয়। কারণ এর নিচে বায়ুমণ্ডলের চাপ এত বেশী হয়ে পড়ে যে, বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি আর গ্যাসীয় অবস্থায় থাকতে পারে না, তরল হয়ে পড়ে। বায়ুমণ্ডলের নিচে থেকে প্রায় কেন্দ্র পর্যন্ত বৃহস্পতির সবটাই তরল হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরী। অবশ্য বায়ুমণ্ডলের 24,000 কিলোমিটার নিচে প্রচণ্ড চাপের দরুন তরল হাইড্রোজেনে ধাতুর মত গুণ দেখা দেয় এবং তা বিদ্যুৎপরিবাহী হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বৃহস্পতির ভেতরের ঐ বিদ্যুৎপরিবাহী অংশই হলো তার তীব্র চুম্বকীয় ক্ষেত্রের উৎস।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে তিনটি প্রধান স্তর আছে। তরল হাইড্রোজেনের স্তরের ওপরেই যে অংশ সেটা হলো বরফের কণা দিয়ে তৈরী। এই স্তরের ওপরে আছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের একটা পাতলা স্তর। তার ওপরে আছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসালফাইড্ কণা দিয়ে তৈরী স্তর। বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ওপরের স্তরটা হলো জমাট অ্যামোনিয়া কণা দিয়ে তৈরী। অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন থাকার দরুন বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল যে দুর্গন্ধময় হবে তাতে সন্দেহ নেই।

সূর্য থেকে দূরে হওয়ার দরুন সূর্যের খুব কম তাপই বৃহস্পতি পর্যন্ত পৌঁছয়। সুতরাং এটা ভাবা স্বাভাবিক যে, বৃহস্পতি খুবই ঠাণ্ডা হবে। কিছুকাল আগে পর্যন্তও সেরকম একটা ধারণাই ছিল। পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ করে বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের তাপমাত্রা পাওয়া যায় শূন্য ডিগ্রীর নিচে 120 ডিগ্রী সেলসিয়স। কিন্তু পরে জানতে পারা গেছে যে, বাইরেটা ঠাণ্ডা হলেও বৃহস্পতির ভেতরটা খুবই গরম। একটা অনুমান হিসেবে বায়ুমণ্ডলের নিচে, 1000 কিলোমিটার গভীরে তাপমাত্রা প্রায় 2000 ডিগ্রী। 24,000 কিলোমিটার নিচে, যেখানে তরল ধাতব হাইড্রোজেনের স্তর শুরু হচ্ছে, তাপমাত্রা হয়ে দাঁড়ায় প্রায় 11,000 ডিগ্রীর কাছাকাছি। বৃহস্পতির কেন্দ্রের তাপমাত্রা 30,000 ডিগ্রীর কাছাকাছি হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে।

বৃহস্পতির ভেতরে অত বেশী উত্তাপ কোথা থেকে আসছে তা সঠিক জানা নেই। তবে অনুমান করা হচ্ছে যে, ভেতরের প্রচণ্ড মহাকর্ষ বলই হলো ঐ উত্তাপের উৎস। দেখা গেছে যে, যে পরিমাণ উত্তাপ সূর্য থেকে বৃহস্পতি গ্রহণ করে তার চেয়েও প্রায় তিন গুণ তাপ সে মহাশূন্যে বিকিরণ করে। এছাড়া, প্রবল চুম্বকীয় ক্ষেত্র থাকার দরুন বৃহস্পতি থেকে প্রচুর রেডিওতরঙ্গ উৎপন্ন হয়।



বৃহস্পতির উপগ্রহ 'ইউরোপা'।

আজ পর্যন্ত বৃহস্পতির 14টি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে চারটি হলো খুবই বড়, অন্যগুলি খুবই ছোট। বৃহস্পতির চারটি বড় উপগ্রহের সন্ধান প্রথম পাওয়া যায় 1610 সালে। বিখ্যাত ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও দূরবীন দিয়ে প্রথম এই চারটি উপগ্রহকে দেখেছিলেন। পরে আরও শক্তিশালী দূরবীন আবিষ্কার হওয়ার পর অন্যগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। 14 নম্বর উপগ্রহটির সন্ধান পাওয়া গেছে ভয়েজার গ্রহযান থেকে পাঠানো ছবিতে।

বৃহস্পতির 14টি উপগ্রহ দেখে মনে হয় তারা যেন তিনটি আলাদা ঝাঁকে গ্রহটিকে পরিক্রমা করছে। 1নং থেকে 5নং পর্যন্ত এবং 14নং নিয়ে প্রথম ঝাঁক, এরা রয়েছে মূল গ্রহের সবচেয়ে কাছে, প্রায় তার বিষুবতল বরাবর। এদের কক্ষ-পথ বৃত্তাকার এবং গ্রহের চারদিকে ঘুরতে সময় নেয় 12 ঘণ্টা থেকে 16 দিন

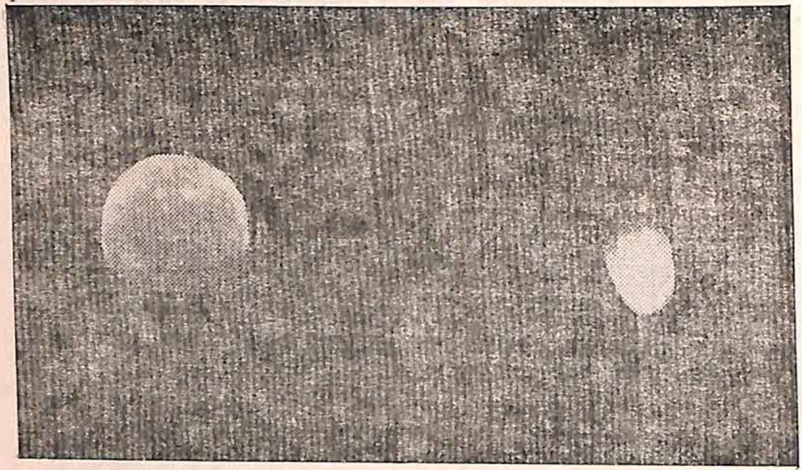
পর্যন্ত। দ্বিতীয় ঝাঁক 6নং, 7নং, 10নং ও 13নং নিয়ে, এরা রয়েছে গ্রহ থেকে বেশ দূরে। দ্বিতীয় ঝাঁকের উপগ্রহগুলির কক্ষপথ উৎকেন্দ্রিক আর সেটি গ্রহের বিষুবতলের সঙ্গে প্রায় 30 ডিগ্রী হেলানো এই ঝাঁকের উপগ্রহগুলি বৃহস্পতির চারদিকে একবার ঘুরতে সময় নেয় প্রায় আট মাস।

তৃতীয় ঝাঁকের চারটি উপগ্রহের কক্ষপথও উৎকেন্দ্রিক, তবে সেগুলির দূরত্ব আরও বেশী। এই ঝাঁকের উপগ্রহগুলির বিশেষত্ব হলো এই যে, এগুলি গ্রহের গতির বিপরীত দিকে চলে। বৃহস্পতিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এদের সময় লাগে দু বছর। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, একেবারে বাইরের ঝাঁকের এই উপগ্রহগুলি আসলে হলো বৃহস্পতির টানে বাঁধা পড়া গ্রহাণু। এরকম হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়, কারণ এই উপগ্রহগুলির কোনওটারই ব্যাস 30 কিলোমিটারের বেশি নয়।

বৃহস্পতির বড়ো চারটি উগগ্রহ—আইও (Io), ইউরোপা (Europa), গ্যানিমীড্ (Ganymede) ও ক্যালিস্টো (Callisto) সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য ভয়েজার গ্রহযানগুলি থেকে পাওয়া গেছে। এছাড়া আরও জানতে পারা গেছে যে, বৃহস্পতির চারপাশেও শনির মত রিং বা বলয় আছে, যদিও তা খুবই ক্ষীণ।

ভয়েজার থেকে পাওয়া সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর হলো উপগ্রহ আইওর ওপর সক্রিয় আগ্নেয়গিরির সন্ধান। এর আগে পৃথিবীর বাইরে সৌরমণ্ডলে অন্য কোথাও সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে বলে জানা ছিল না। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, বুধ, শুক্র, মঙ্গল এবং আমাদের চাঁদেও অনেক আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেগুলি সবকটিই এখন মৃত। আইওর অগ্ন্যুৎগিরণ দেখে মনে হয়, উপগ্রহটি গন্ধকজাত বস্তু দিয়ে তৈরী। এর ভেতরটা খুবই গরম। আবার অন্য আর একটি উপগ্রহ ইউরোপা প্রায় সবটাই মসৃণ বরফে ঢাকা। ক্যালিস্টো এবং গ্যানিমীডের বেলায় দেখা গেছে, উপগ্রহ দুটির উপরিতল অসংখ্য গর্তে ভরা।

বৃহস্পতি সম্বন্ধে গত কয়েক বছরে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। তবে এখনও অনেক কিছু অজানা আছে। যেমন ধরো, বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের তলায় কি আছে তার সঠিক রূপ আমরা আজও জানি না, যদিও তার একটা আভাস বিজ্ঞানীরা আমাদের দিয়েছেন। আবার বৃহস্পতি বুকে প্রচণ্ড ঘূর্ণীঝড়ের উৎস কোথায় তাও আমাদের জানা নেই। এসব প্রশ্নের উত্তর হয়তো আমরা পাবো



বৃহস্পতির উপগ্রহ 'অ্যামালথিয়া' (বাঁয়ে) এবং 'ক্যালিস্টো' (ডাইনে)

আর তিন চার বছর পরে যখন 'গ্যালিলিও' (Galileo) নামক গ্রহযান বৃহস্পতি অভিমুখে পাঠানো হবে। গ্রহটির কাছে পৌঁছবার পর গ্যালিলিও থেকে একটি অবতরণযান বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল ভেদ করে নামানো হবে। মূল গ্রহযানটিকে সেসময় বৃহস্পতির কক্ষে স্থাপন করা হবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই পরিকল্পনা সফল হলে বৃহস্পতি সম্বন্ধে অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর মিলবে। গ্রহের রাজার আসল রূপ হয়তো তখনই আমরা জানতে পারব।

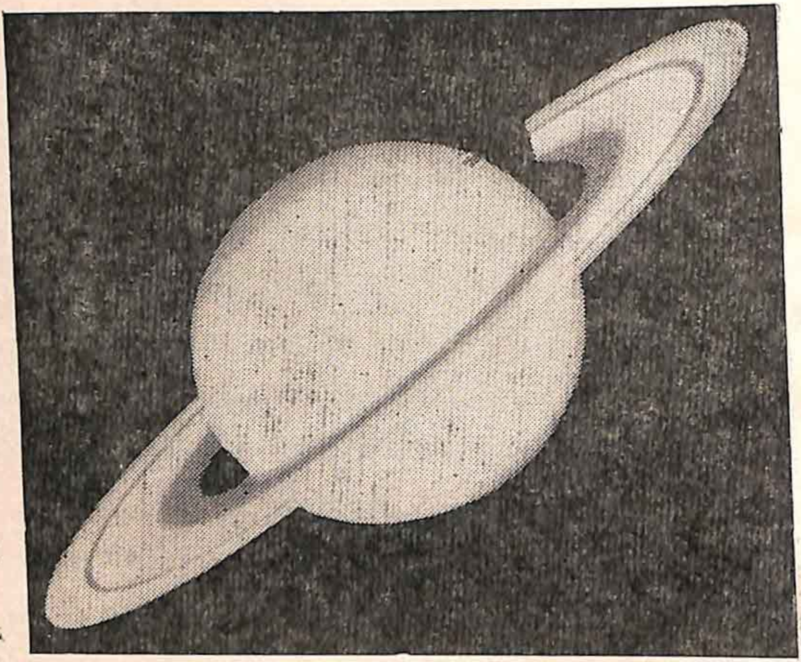
বলয়ের রাজা শনিগ্রহ

সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে দূরের যে গ্রহটিকে শুধু চোখে আমরা দেখতে পাই তা হলো শনি। আয়তনে শনি প্রায় বৃহস্পতিরই সমান, কিন্তু দূরে থাকার দরুন আকাশে একে খুব একটা উজ্জ্বল দেখায় না। দেখায় হালকা হলদে রঙের মাঝারী গোছের একটা তারার মতো। এ ছাড়া, দূরে থাকার দরুন কক্ষপথে শনির গতিও খুব মন্থর। সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরতে শনির সময় লাগে প্রায় সাড়ে উনত্রিশ বছর। ফলে আকাশ পথে এর চলাটাও খুব আস্তে দেখায়।

এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি। আজ থেকে মাত্র দুশো বছর আগেও মানুষের ধারণা ছিল যে, পৃথিবীকে নিয়ে সৌরমণ্ডলে মোট গ্রহের সংখ্যা হলো ছয়, আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে বাইরের গ্রহ হলো শনি। আজ অবশ্য আমরা জানি, এ ধারণা ভুল। কারণ শনির পরে আরও তিনটি গ্রহ আছে যার খোঁজ পরবর্তীকালে পাওয়া গেছে।

শুধু চোখে কোনও বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া না গেলেও দূরবীনে শনিগ্রহকে দেখায় অদ্ভুত সুন্দর। আর সেই সৌন্দর্যের কারণ তার বলয় বা রিং। সাম্প্রতিক-কালে আমরা জানতে পেরেছি যে, বৃহস্পতি, ইউরেনাস এবং নেপচুন গ্রহেরও বলয় আছে। কিন্তু শনির বলয়ের কাছে সেগুলি তুচ্ছ। সৌন্দর্য এবং জটিলতায় শনির বলয় হলো অদ্বিতীয়।

শনির বলয়ের সন্ধান সর্বপ্রথমে পাওয়া গিয়েছিল 1610 সালে। সে বছর জুলাই মাসে ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও তাঁর সদ্যনির্মিত দূরবীনে শনিকে দেখতে গিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন যে, অন্যান্য গ্রহের মত শনির আকার গোল নয়, তার দুপাশে কাপের হাতলের মতো যেন দুটি হাতল লাগানো। গ্যালিলিও প্রথমে মনে করেছিলেন, তিনি হয়তো শনির সঙ্গে তার দুটি উপগ্রহকে দেখেছেন। কিন্তু এ ধারণা ভেঙে গেল, যখন তিনি দেখলেন যে কয়েক বছরের মধ্যে ঐ হাতলের মতো বস্তু দুটি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, অদৃশ্য হয়ে যাবার কয়েক বছর পরে ঐ 'হাতল' দুটিকে আবার দেখতে পাওয়া গেল। গ্যালিলিওর কাছে যে দূরবীন



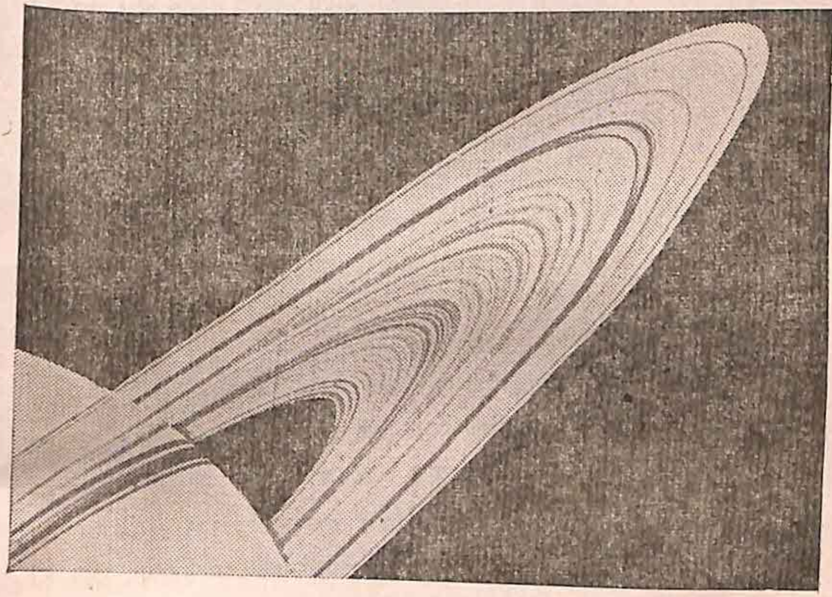
শনিগ্রহ।

ছিল তা দিয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু আর দেখা সম্ভব ছিল না। সুতরাং শনির ঐ 'হাতল' দুটি আসলে কি তিনি তাঁর জীবনকালে জানতে পারেন্‌নি। এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় গ্যালিলিওর মৃত্যুর 17 বছর পর।

1655 সালে হল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্‌স (Christian Huygens) অনেক বেশি শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে শনিগ্রহকে দেখে বুঝতে পারলেন যে, শনিগ্রহের 'হাতল'গুলি আসলে হলো বিশাল একটি বলয় যা গ্রহটিকে কোথাও স্পর্শ না করে তাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করে আছে। 1569 সালে হাইগেন্‌স তাঁর ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে, কক্ষপথে শনিগ্রহ প্রায় 26·7 ডিগ্রী হেলে থাকার দরুণ তার বলয়কে পৃথিবী থেকে প্রতি 15 বছর অন্তর প্রায় ধার বরাবর দেখা যায়, যার ফলে চ্যাপটা বলয়টি প্রায় অদৃশ্য বলেই মনে হয়।

ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্‌সের সময় বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, শনির বলয়

একটিই। কিন্তু পরে এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। 1657 সালে ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী গিওভানি ক্যাসিনি (Giovanni Cassini) আরও শক্তিশালী দূরবীনে দেখতে পেলেন যে, শনির বলয়টি দুটি ভাগে ভাগ করা। একটি বড় বলয়ের মধ্যে একটি ছোট বলয় আছে আর তাদের মাঝের জায়গাটা ফাঁকা যা দূরবীনে কালো দেখায়। ক্যাসিনির নামানুসারে সেই ফাঁকের নাম রাখা হয়েছে 'ক্যাসিনির বিভাগ'। বাইরের পাঁশুটে সাদা বলটিকে বলা হয় 'A'-বলয় এবং উভেতরের জ্জল সাদা ক বলা হয় ,বলয়টিB'-বলয়।



ভয়েজার গ্রহযান থেকে তোলা শনির বলয়ের ছবি।

এরপর 1838 সালে 'B'-বলয়ের ভেতরের দিকে আরও একটি বলয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। জার্মান জ্যোতির্বিদ গটফ্রেড গ্যালে'র (Gottfred Galle) আবিষ্কৃত ক্রেপ কাগজের মতো অস্বচ্ছ নীলচে ধূসর রঙের এই বলয়টির নাম রাখা হয় 'ক্রেপ' বা 'C'-বলয়। 1969 সালে ক্রেপ বলয়ের ভেতরের দিকে আরও একটি হাল্কা বলয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, নাম রাখা হয় 'D'-বলয়। এরপর 1979 সালে পাইয়োনিয়ার-11 গ্রহযান থেকে তোলা ছবিতে আরও দুটি বলয়—'E' এবং 'F'-বলয়ের খোঁজ পাওয়া যায়। মানে 1979 সালে শনির

মোট ছ'টি বলয় আছে বলেই মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু তারপর ঘটে এক অদ্ভুত ঘটনা।

1980 সালের নভেম্বর মাসে ভয়েজার-1 গ্রহযান শনির পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় শনির যে ছবি তুলে পাঠায় তাতে দেখা যায় যে, তার বলয়ের সংখ্যা 6 বা 7 তো নয়ই, একশো বা দুশোও নয়। সেসব ছবিতে দেখা যায় যে, সব মিলিয়ে কয়েক হাজার নানা আকারের বলয় গ্রহটির চারপাশে ঘুরছে! এরপর 1981 সালের আগস্ট মাসে ভয়েজার-2 গ্রহযানের আরও উন্নত ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিতে দেখা গেল, মোট বলয়ের সংখ্যা হয়তো কয়েক লাখও হতে পারে। যে সব জায়গায় পৃথিবী থেকে দেখে ফাঁক আছে বলে মনে হত সেসব ফাঁকের মধ্যেও অসংখ্য সূক্ষ্ম বলয় আছে দেখা গেল। সবে মিলে শনির বলয়ের রূপটা হয়ে দাঁড়ালো অনেকটা একটা সূক্ষ্ম খাঁজ-কাটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মত। অবশ্য সেটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো কঠিন নয়।

ভয়েজার গ্রহযান দুটি থেকে পাঠানো ছবিতে শনির বলয়ের মধ্যে অনেক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়লো। দেখা গেল যে, বলয়ের ওপর কিছু অংশে চাকার পাখি বা স্পোকের মত ছোপ ছোপ দাগ আছে যা বলয়ের সঙ্গে তাল রেখে ঘোরে না, বরং ঘোরে শনির চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে তাল রেখে। কিছু বলয়ের ক্ষেত্রে আবার দেখা গেল, সেগুলি যেন পরস্পরের সঙ্গে বিনুনি পাকিয়ে আছে। শনির বলয়ের এই সব অদ্ভুত আচরণ বিজ্ঞানীদের বেশ অবাকক রে দিয়েছে। তাঁদের কাছে শনির বলয় যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

শনির বলয়গুলি কি দিয়ে তৈরী তা আজও জানতে পারা যান নি। তবে পৃথিবী থেকে তোলা ছবি এবং গ্রহযান থেকে পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করে যা জানতে পারা গেছে তা থেকে মনে হয় যে, সেগুলি মুখ্যতঃ বিভিন্ন সাইজের বরফের টুকরো দিয়ে তৈরী। আকারে সেগুলি মাত্র কয়েক মিলিমিটার থেকে নিয়ে কয়েক মিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। আবার ঐ বরফের টুকরোর সমাবেশ সব জায়গায় একরকম নয়, কোথাও কম কোথাও বেশী, যার ফলে বলয়গুলির ঘনত্বও আলাদা আলাদা দেখা।

ঘনত্বের তারতম্যের ভিত্তিতে শনির বলয়গুলিকে সাতটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। মূলগ্রহের সবচেয়ে কাছের বলয়টি হলো 'D'-বলয়। তারপর আছে 'C' বলয় যা প্রায় 17,5000 কিলোমিটার চওড়া। এরপর প্রায় 1800 কিলো-মিটার এলাকায় কোন বলয় নেই। তারপর আছে 25,340 কিলোমিটার চওড়া

B-বলয়। 'B'-বলয়ের পর আছে প্রায় 5000 কিলোমিটার চওড়া 'ক্যাসিনির বিভাগ'। এর পরে প্রায় 13,900 কিলোমিটার চওড়া 'A'-বলয়। 'A'-বলয়ের পরে আছে প্রায় 4000 কিলোমিটার চওড়া ফাঁকা এলাকা যাকে বলা হয় 'পায়োনিয়ার বিভাগ'। পায়োনিয়ার বিভাগের পরে আছে খুবই ক্ষীণ একটি বলয়, নাম 'F'-বলয়। এরপর প্রায় 10,000 কিলোমিটার দূরে আছে 'G'-বলয়। এটি চওড়ায় প্রায় 3,60) কিলোমিটার। শনির সবচেয়ে বাইরের বলয় হলো প্রায় 1,20,000 কিলোমিটার চওড়া 'E'-বলয়। এ বলয়টি খুব ক্ষীণ।

শনির এইসব বলয়গুলি যতই চওড়া হোক না কেন, সেগুলি কিন্তু খুবই পাতলা। সম্ভবতঃ সেগুলি কোথাওই 10-15 কিলোমিটারের বেশী পুরু নয়!

এখন তোমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে, শনির ঐ বলয় এলো কোথা থেকে? এর সঠিক উত্তর কারো জানা নেই, তবে এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে। 1800 সালে এক ফরাসী বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড রচি (Edward Roche) গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, একটি গ্রহের চারপাশে প্রদক্ষিণশীল উপগ্রহ যদি মূলগ্রহের ব্যাসার্ধের 2·45 গুণ দূরে এসে পড়ে তা হলে উপগ্রহটি মহাকর্ষের প্রচণ্ড শক্তির ক্রিয়ায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়ে বলয়ে রূপান্তরিত হয়। গ্রহের ব্যাসার্ধের 2·45 গুণ দূরের ঐ সীমানাকে বলা হয় 'রচির সীমানা' বা Roche Limit। কোন গ্রহের উপগ্রহ যদি ঐ রচির সীমানার মধ্যে এসে পড়ে তা হলে তা ভেঙ্গেচুরে বলয়ে রূপান্তরিত হয়ে থাকে—এটাই ছিল রচির বাখ্যা। কিন্তু আজ এই ব্যাখ্যা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। শনির সদ্য খুঁজে-পাওয়া অন্ততঃ তিনটি উপগ্রহের বেলায় দেখা গেছে সেগুলির দূরত্ব রচির সীমানা থেকেও অনেক কম। সুতরাং শনির ঐ বলয়ের উদ্ভব কিভাবে হলো তা আজও অজানা রয়ে গেছে।

শনির বলয়কে বাদ দিলে মূলগ্রহটিকে দেখতে প্রায় বৃহস্পতির মতোই। আয়তনে অবশ্য শনি বৃহস্পতির চেয়ে ছোট। শনির আয়তন পৃথিবীর তুলনায় প্রায় 750 গুণ, সে তুলনায় বৃহস্পতি পৃথিবীর চেয়ে 130) গুণ বড়। বৃহস্পতির মতো শনিও প্রধানত গ্যাসীয় পদার্থের তৈরী এবং সেজন্যে তার ঘনত্বও খুব কম। তবে বৃহস্পতির তুলনায় শনি অনেক হাল্কা। বৃহস্পতির ঘনত্ব হলো 1·3। সে তুলনায় শনির ঘনত্ব মাত্র 0·7। অর্থাৎ শনি হলো জলের চেয়েও হাল্কা। যদি কোনও অতিকায় জলের সমুদ্রে শনিগ্রহকে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে বিশাল ঐ গ্রহটি

ডুবে যাবে না, বরং রাবারের বলের মত ভাসবে। আসলে শনি হলো সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে হাল্কা গ্রহ।

বৃহস্পতির সঙ্গে শনির আর একটা সাদৃশ্য হলো তার দ্রুত আহ্নিক গতি। নিজের অক্ষে একবার ঘুরতে শনির সময় লাগে মাত্র 10 ঘণ্টা 39·4 মিনিট। এর ফলে বৃহস্পতির মতো শনির বিষুব অঞ্চলও তার মেরু অঞ্চলের তুলনায় ফোলা। শনির বিষুবীয় ব্যাস হলো 1,20,000 কিলোমিটার আর তার মেরু অঞ্চলের ব্যাস 1,08,000 কিলোমিটার। দুটির মধ্যে তফাৎ 12,000 কিলোমিটারের।

সূর্য থেকে শনির গড় দূরত্ব 142 কোটি 80 লক্ষ কিলোমিটার। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে শনির সময় লাগে 29·46 বছর, তবে প্রতি 378 দিন অন্তর শনি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসে পড়ে। সে সময় তাদের মধ্যে দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় 119 কোটি 70 লক্ষ কিলোমিটার। শনি যখন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে সরে যায়, তখন এই দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় 165 কোটি 40 লক্ষ কিলোমিটার।

দূরবীনে শনির গোলকটিকে প্রায় বৃহস্পতির মতোই দেখায়। বৃহস্পতির মতো শনির গায়েও রঙ-বেরঙের ডোরা দাগ দেখতে পাওয়া যায়। তবে শনিগ্রহে চাঞ্চল্য যেন একটু কম বলেই মনে হয়। আর ডোরার রঙগুলোও বৃহস্পতির তুলনায় অনেক হাল্কা। ভয়েজার গ্রহযান থেকে তোলা ছবিতে অবশ্য শনির বায়ুমণ্ডলেও প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ভয়েজার-2 থেকে তোলা ছবিতে শনির দক্ষিণ গোলার্ধে প্রায় 11,200 কিলোমিটার লম্বা ডিমের মতো এলাকার সন্ধান পাওয়া গেছে, যা দেখতে অবিকল বৃহস্পতির লাল ছোপের মতো।

পায়োনিয়ার ও ভয়েজার গ্রহযান থেকে পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করে জানতে পারা গেছে যে, বৃহস্পতির মতো শনিও মুখ্যতঃ হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম গ্যাসে তৈরী। আর দুটি গ্রহের ভেতরের গঠনও সম্ভবত একইরকম। অর্থাৎ, শনির ভেতরটাও তরল গ্যাসের তৈরী আর তারও উপরিতল বলতে কিছু নেই। পৃথিবী থেকে যে অংশটা আমরা দেখতে পাই সেটা হলো শনির বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগ।

বৃহস্পতির মতো শনির বায়ুমণ্ডলেরও উপরিভাগের তাপমাত্রা খুবই কম। ভয়েজার-2 এর যন্ত্রপাতিতে বায়ুমণ্ডলের 40 কিলোমিটার নিচের তাপমাত্রা পাওয়া গেছে মাইনাস্ 18 ডিগ্রী সেলসিয়াস। তবে শনির ভেতরের তাপমাত্রা সম্ভবত খুবই বেশি। কারণ পায়োনিয়ার গ্রহযান থেকে মাপজোখ করে দেখা গেছে যে,

শনি যে পরিমাণ শক্তি সূর্য থেকে গ্রহণ করে তার চেয়ে প্রায় তিনগুণ শক্তি সে মহাশূন্যে বিকিরণ করে। এখানেও বৃহস্পতির সঙ্গে শনির সাদৃশ্য অদ্ভুত।

বলয় ছাড়াও শনির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর উপগ্রহ সংখ্যা। আজ পর্যন্ত গ্রহটির 17টি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে 9টি হলো বড় বা মাঝারি সাইজের আর বাকি 8টি খুবই ছোট। 1980 সাল পর্যন্ত শনির মাত্র 10টি উপগ্রহের কথাই আমাদের জানা ছিল। 1980 সালের নভেম্বর মাসে ভয়েজার-1 গ্রহযান শনিগ্রহের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় যেসব ছবি তুলে পাঠায় তাতে আরও 5টি ছোট উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর 1981 সালে দ্বিতীয় ভয়েজার গ্রহযান আরও দুটি উপগ্রহের সন্ধান দেয়।

শনির উপগ্রহগুলির প্রত্যেকটিরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সবচেয়ে ছোট উপগ্রহটির ব্যাস মাত্র 30 কিলোমিটার। আবার সবচেয়ে বড় উপগ্রহ টাইটানের (Titan) ব্যাস প্রায় 5120 কিলোমিটার, অর্থাৎ বুধগ্রহের চেয়েও বড়। এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি। 1980 সালের আগে শনির টাইটান-কেই সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ বলে ধরা হতো। কারণ তখন ধারণা ছিল যে টাইটানের ব্যাস হলো 5800 কিলোমিটার। ভয়েজার-1 গ্রহযান এই ভুল ভেঙ্গে দেয়। ভয়েজার থেকে পাঠানো ছবি ও তথ্য থেকে জানতে পারা যায় যে টাইটানের ব্যাস আসলে 5117 কিলোমিটার। অর্থাৎ সে হলো বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমীড-এর চেয়েও ছোট। গ্যানিমীডের ব্যাস হলো 5220। টাইটানের নিজস্ব বায়ুমণ্ডল আছে, যার প্রধান উপাদান হলো নাইট্রোজেন। টাইটানের উপরিতলে বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর তুলনায় প্রায় দেড় গুণ, সেখানে তাপমাত্রা পাওয়া গেছে মাইনাস 182 ডিগ্রী সেলসিয়াস। বিজ্ঞানীদের ধারণা টাইটানের উপরিতল তরল অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডে ঢাকা।

অন্যান্য উপগ্রহগুলির মধ্যে 1120 কিলোমিটার ব্যাসের 'দিওন'কে **(Dione)** দেখতে প্রায় আমাদের চাঁদের মতো। 1440 কিলোমিটার ব্যাসের উপগ্রহ আয়াপিটাসের (Iapetus) বিশেষত্ব হলো এই যে, এর একটা দিক একেবারে সাদা, অপরদিকটা একেবারে কালো রঙের। কেন এমনটি হয়েছে তা অবশ্য বিজ্ঞানীদের জানা নেই। মিমাস (Mimas) নামক উপগ্রহটি আকারে খুবই ছোট, এর ব্যাস মাত্র 390 কিলোমিটার। কিন্তু এর ওপর এক বিরাট গহ্বর আছে যার ব্যাস 100 কিলোমিটারেরও বেশি। আর একটি উপগ্রহ টেথিস (Tethys) এর

ব্যাস 1440 কিলোমিটার। এই উপগ্রহটির বিশেষত্ব হলো 750 কিলোমিটার লম্বা ও 60 কিলোমিটার চওড়া এক বিশাল গিরিখাত।

শনির উপগ্রহগুলির মধ্যে সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ হলো 1980 সালে আবিষ্কৃত 15 নম্বর উপগ্রহটি। শনির কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব মাত্র 1 লক্ষ 36 হাজার কিলোমিটার। সে তুলনায় সবচেয়ে দূরের উপগ্রহ 'ফিবি' (Phoebe)-র দূরত্ব হলো 1 কোটি 29 লক্ষ 60 হাজার কিলোমিটার। ফিবির আর একটা বিশেষত্ব এই যে, অন্য সব উপগ্রহ যেদিকে ঘোরে এটি তার উল্টোদিকে ঘোরে।

1980 সালের পর শনির বলয়, তার গঠন ও উপগ্রহের সম্বন্ধে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা গ্রহটি সম্বন্ধে আমাদের পুরানো ধারণা প্রায় সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি শনিগ্রহ সত্যিই কত জটিল। গ্রহটি সম্বন্ধে অনেক রহস্যের সমাধান আজও পাওয়া যায় নি। ভবিষ্যতে গ্রহযান পাঠিয়ে আরও অনেক চমকপ্রদ তথ্য হয়তো পাওয়া যাবে।

হার্শেলের 'ধূমকেতু' ঃ ইউরেনাস

আজ থেকে মাত্র দুশো বছর আগে আমাদের সৌরমণ্ডল সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান অনেক সীমিত ছিল। সেসময় মনে করা হত যে, পৃথিবীকে নিয়ে সৌরমণ্ডলের মাত্র ছ'টি গ্রহ আছে যাদের মধ্যে সবচেয়ে দূরের গ্রহ হলো শনি। এরকম হওয়ার অবশ্য একটা বিশেষ কারণ ছিল। যেমন ধরো বুধ, শুক্র ও মঙ্গল আকারে ছোট হলেও পৃথিবীর খুব কাছে থাকার দরুন সেগুলিকে শুধু চোখেই দেখতে পাওয়া যায়। আবার অন্যদিকে বৃহস্পতি ও শনির দূরত্ব খুব বেশি, কিন্তু সেগুলি আয়তনে খুব বড়। সেজন্যে তাদেরও সহজেই শুধু চোখে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সৌরমণ্ডলের বাকি তিনটি গ্রহ ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর বেলায় তা নয়। বাইরের ঐ তিনটি গ্রহ আকারেও খুব একটা বড় নয়, অথচ পৃথিবী থেকে তাদের কক্ষপথের দূরত্ব অনেক বেশি। সেজন্যে দূরবীন আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত সেগুলির সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল না। অবশ্য অনেকে মনে করেন, আকাশ খুব পরিষ্কার থাকলে অমাবস্যার রাত্রে ইউরেনাসকেও শুধু চোখে দেখা সম্ভব। তবে তাকে এত ক্ষীণ দেখাবে যে তা না দেখতে পাওয়ারই মতো। আর সেজন্যেই হয়তো প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কেউই ইউরেনাসকে নিয়ে মাথা ঘামান নি।

সৌরমণ্ডলের বাইরের দিকের তিনটি গ্রহের প্রথমটির সন্ধান পাওয়া যায় 1781 সালে। অবশ্য সেসময় কেউ ভাবতেই পারত না যে, শনিগ্রহের চেয়ে দূরেও কোনও গ্রহ থাকতে পারে। আর সেজন্যেই যখন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়ম হার্শেল (William Herschel) তাঁর দূরবীনে ইউরেনাসকে প্রথম দেখতে পেলেন তখন তিনি তাকে 'ধূমকেতু' বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

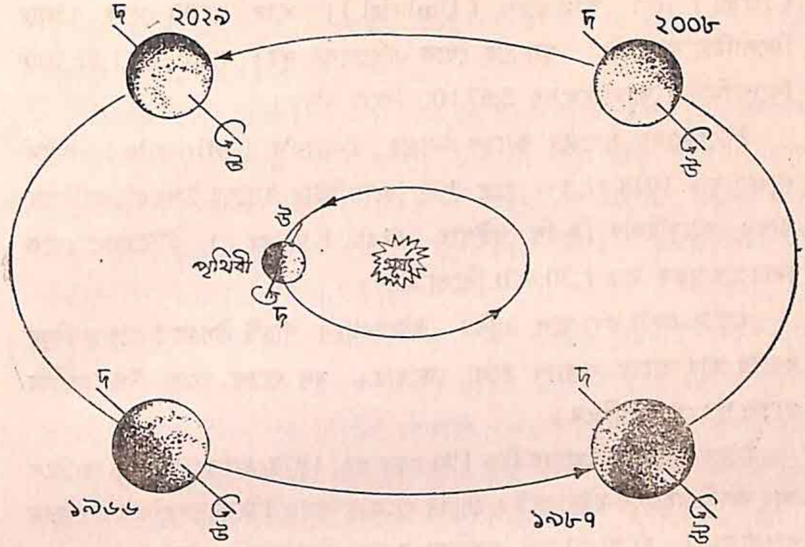
ঘটনাটা ঘটেছিল 17১1 সালের 13 মার্চ তারিখে। সেদিন রাত্রে ইংলণ্ডের বাথ শহরে হার্শেল তাঁর নিজের তৈরী প্রতিফলক দূরবীনে মিথুন রাশির তারাগুলির অধ্যয়ন করতে গিয়ে তাদের মধ্যে নতুন এক জ্যোতিষ্ককে দেখতে পেলেন, যেটাকে দেখতে অনেকটা গ্রহের মতো। কিন্তু বইপত্র ঘেঁটে হার্শেল দেখলেন যে, মিথুন রাশিতে সেসময় কোনও গ্রহের থাকার কথা নয়। অন্ততঃ সে সময় যে কটি গ্রহের বিষয় মানুষ জানত সেগুলির কোনওটির তো নয়ই। প্রথমে হার্শেল মনে করলেন, তিনি হয়তো কোনও নতুন ধূমকেতুর সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর

এই ধারণা কিছুদিনের মধ্যেই ভুল প্রমাণিত হলো। অঙ্ক কষে জ্যোতিষ্কটির কক্ষপথ নির্ণয়ের পর দেখা গেল সে, সেটা আসলে একটা গ্রহ, সৌরমণ্ডলের অন্য গ্রহগুলির মতোই সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। তবে সূর্য থেকে গ্রহটির দূরত্ব পাওয়া গেল অন্যান্য গ্রহের তুলনায় অনেক বেশি, গড়ে প্রায় 287 কোটি 50 লক্ষ কিলোমিটার। মানে সূর্য থেকে শনির যা দূরত্ব তার দ্বিগুণের চেয়েও বেশি।

হার্শেল প্রথমে সদ্যআবিষ্কৃত ঐ গ্রহটির নাম ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের নামানুসারে রাখেন 'জর্জের তারা'। অন্যান্যরা আবার গ্রহটিকে 'হার্শেল' বলেই অভিহিত করেন। অবশেষে 1850 সাল নাগাদ গ্রহটিয় নাম রাখা হয় ইউরেনাস (Uranus)।

সূর্য থেকে দূরত্ব দেখে তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছে যে, সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরতে ইউরেনাসের অনেক বেশি সময় লাগা উচিত। হ্যাঁ, ঠিক তাই। সূর্যের চার দিকে একবার ঘুরে আসতে গ্রহটির সময় লাগে 84 বছর। আয়তনে বৃহস্পতি ও শনির চেয়ে অনেক ছোট হলেও পৃথিবীর তুলনায় ইউরেনাস অনেক বড়। ইউরেনাসের গড় ব্যাস হলো 51,800 কিলোমিটার, মানে পৃথিবীর ব্যাসের চারগুণ। আয়তনে ইউরেনাস পৃথিবীর চেয়ে প্রায় 70 গুণ বড়, কিন্তু ঘনত্ব কম হওয়ার দরুন এর ভর পৃথিবীর চেয়ে $14\frac{1}{2}$ গুণ বেশী। এর কারণ কি তা তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে। হ্যাঁ, ইউরেনাসও হলো বৃহস্পতি ও শনির মতো হাল্কা গ্যাসীয় পদার্থের তৈরী। অবশ্য এখানে একটা তফাৎ আছে। তা হলো এই যে, সূর্য থেকে বহু দূরে থাকার দরুন ইউরেনাস এত ঠাণ্ডা যে এর প্রায় সমস্ত গ্যাসই জমাট অবস্থায় আছে। বর্ণালী বিশ্লেষণ করে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয়, ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডলের বেশির ভাগটাই হলো মিথেন গ্যাসের তৈরী। আর সেজন্যেই গ্রহটিকে দূরবীনে হাল্কা সবুজ রঙের দেখায়। ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের তাপমাত্রা পাওয়া গেছে শূন্যেরও 210 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে।

পৃথিবী থেকে অত দূরে থাকার দরুন শক্তিশালী দূরবীনেও ইউরেনাসের ওপর বেশি একটা কিছু চোখে পড়ে না। কেবল কিছু হাল্কা ছোপ দাগ দেখতে পাওয়া যায়। ঐ সব দাগের অধ্যয়ন করে গ্রহটির আহ্নিক গতির একটা আভাস বিজ্ঞানীরা অনেক দিন আগেই পেয়েছিলেন, কিন্তু তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আগে মনে করা হত যে, গ্রহটি নিজের অক্ষে 10 ঘণ্টা 49 মিনিটে এক পাক খায়। কিন্তু পরে জানতে পারা গেছে যে, সেই ঘূর্ণনের হার সম্ভবত 16 ঘণ্টায় এক বার।



কক্ষপথে ইউরেনাস। দেখা যাচ্ছে যে প্রতি 42 বছর অন্তর পৃথিবী থেকে গ্রহটির মেরু অঞ্চল দেখতে পাওয়া যায়।

আরও একটা অদ্ভূত ব্যাপার হলো ইউরেনাসের অক্ষের নতি। তোমরা দেখেছ যে, বেশির ভাগ গ্রহের অক্ষ তার কক্ষতলের ওপর সিধে খাড়া অবস্থায় নেই, কিছুটা হেলে আছে। যেমন ধরো, পৃথিবীর অক্ষ হেলে আছে $23\frac{1}{2}$ ডিগ্রী, মঙ্গলের 24 ডিগ্রী, বৃহস্পতির 3 ডিগ্রী আর শনির $26\frac{1}{2}$ ডিগ্রী। কিন্তু ইউরেনাসের বেলায় এই নতির হার অনেক বেশি। গ্রহটির অক্ষ তার কক্ষতলের সঙ্গে প্রায় 98 ডিগ্রী হেলে আছে। দেখে মনে হয়, গ্রহটি যেন শুয়ে শুয়ে পাক খেতে খেতে কক্ষপথে এগিয়ে চলেছে। আর একটা মজার কথা হলো এই যে, সমকোণ থেকেও প্রায় 8 ডিগ্রী বেশি হেলে থাকার ফলে ইউরেনাসকে পূব থেকে পশ্চিমে পাক খাচ্ছে বলে মনে হয়।

আজ পর্যন্ত ইউরেনাসের পাঁচটি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে দূরের এবং বড় দুটি আবিষ্কার করেন হার্শেল নিজে 1787 সালে। এ দুটির নাম টাইটানিয়া (Titania, ব্যাস 1800 কিলোমিটার) এবং ওবেরন (Oberon, ব্যাস 1560 কিলোমিটার)। মূলগ্রহ থেকে এদের দূরত্ব যথাক্রমে 4,38,300 কিলোমিটার এবং 5,86,200 কিলোমিটার।

এরপর 1851 সালে আরও দুটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন ইংলণ্ডের উইলিয়ম লাসেল (William Lassel)। উপগ্রহ দুটির নাম রাখা হয় এরিয়েল

(Ariel) এবং আমব্রিয়েল (Umbriel)। ব্যাস 1000 থেকে 1500 কিলোমিটারের মধ্যে। মূল গ্রহ থেকে এরিয়েলের দূরত্ব পাওয়া যায় 1,91,700 কিলোমিটার, আমব্রিয়েলের 2,67,100 কিলোমিটার।

ইউরেনাসের সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ 'মিরাণ্ডা'র (Miranda) সন্ধান পাওয়া যায় 1948 সালে। মাত্র 300 কিলোমিটার ব্যাসের উপগ্রহটি আবিষ্কার করেন আমেরিকার জি পি কুইপার (G.P. Kuiper)। ইউরেনাস থেকে মিরাণ্ডার দূরত্ব মাত্র 1,30,400 কিলোমিটার।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। ইউরেনাসের পাঁচটি উপগ্রহই রয়েছে বিষুব বরাবর আর তাদের কক্ষপথ হলো বৃত্তাকার। মূল গ্রহের মতো উপগ্রহগুলির গতিও পূব থেকে পশ্চিমে।

ইউরেনাসের আবিষ্কারের ঠিক 196 বছর পর, 1977 সালের 10 মার্চ তারিখে আর একটি মহত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। সেদিন রাত্রে সর্বপ্রথম ইউরেনাসের বলয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। ব্যাপারটা ঘটে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে। ভারতের কাভালুর ও নৈনিতাল মানমন্দির সহ বিশ্বের কয়েকটি মানমন্দিরে সেদিন ইউরেনাসকে পর্যবেক্ষণের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কারণ তুলারাশির একটি তারার সামনে দিয়ে গ্রহটির ঐ দিন যাওয়ার কথা ছিল। ইউরেনাসের পেছনে চলে যাওয়ার ঠিক আগে ও পরে তারাটির আলোয় যে তারতম্য হয় তা বিশ্লেষণ করে ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল ঐ পর্যবেক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ঘটনাটির পর তথ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অবাক। তাঁরা দেখলেন যে, আলোর তারতম্যের যে নক্সা পাওয়া গেছে তার ব্যাখ্যা দিতে গেলে ধরে নিতে হবে যে গ্রহটিকে ঘিরে শনির মতো একাধিক বলয় আছে।

ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। যদি ইউরেনাসের বলয় না থাকত, তবে তারার আলো প্রথমে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেত, আবার কিছুক্ষণ পরে হঠাৎই দেখা যেত। ঠিক যেমনটি হয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের বেলায়। কিন্তু এখানে তা হলো না। দেখা গেল, তারার আলো কমপক্ষে দশ বার অদৃশ্য হয়েছে। এখন যদি আমরা ধরে নিই যে, ইউরেনাসের চারপাশে পাঁচটি বলয় আছে তা হলে সহজেই এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কারণ তারাটির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রথমে পাঁচটি বলয়ের ছায়া দেখা যাবে, মানে পাঁচবার তারাটি প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাবে। আবার কিছুক্ষণ পরে, মূল গ্রহটি তারার সামনে থেকে সরে যাওয়ার পর, আবার পাঁচটি বলয়ের ছায়া দেখা যাবে, মানে আরও পাঁচ বার

তারার আলো কমে যাবে। সুতরাং এভাবে তার আলোর কম বেশি দেখেই গ্রহটির বলয়ের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব।

তথ্য বিশ্লেষণ করে জানতে পারা গেছে যে, ইউরেনাসকে বেষ্টন করে কমপক্ষে পাঁচটি বলয় আছে, কারও মতে আবার ঐ সংখ্যা নয়ও হতে পারে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভেতরের বলয়টির ব্যাস হলো আনুমানিক 88,000 কিলোমিটার আর সবচেয়ে বাইরেরটির ব্যাস প্রায় 1,02,00 কিলোমিটার। চওড়ায় বলয়গুলি সম্ভবত: 10 থেকে 100 কিলোমিটারের বেশি নয়।

ইউরেনাসের বিষয় আমরা আজ পর্যন্ত যা কিছু জানতে পেরেছি তার সবটাই হলো কেবলমাত্র দূরবীনে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে। গ্রহটির দূরত্ব এত বেশি যে কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন ধরো গ্রহটির ভেতরের গঠন, আহ্নিক গতি, উপগ্রহগুলির ব্যাস, তাদের দূরত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক তথ্য আজও পাওয়া সম্ভব হয় নি। এছাড়া গ্রহটির বলয়ের গঠনের বিষয়েও অনেক কিছু জানবার আছে।

আগামী 1986 সালের গোড়ার দিকে ভয়েজার-2 গ্রহযানটির ইউরেনাসের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কথা আছে। সেসময় গ্রহটি সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। হতে পারে, সেসব তথ্য ও ছবি থেকেই 'হার্শেলের ধূমকেতু'র আসল রূপটা আমাদের সামনে আসবে।

সীমান্তের গ্রহ ঃ নেপচুন ও প্লুটো

1781 সালে ইউরেনাসের আবিষ্কারের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রথমেই গ্রহটির কক্ষপথ গণনার কাজে মন দিলেন। প্রায় 40 বছর পর্যবেক্ষণের পর 1821 সালে ফ্রান্সের গণিতবিদ্ অ্যালেক্সি বোভার্ড (Alexis Bouvard) নতুন গ্রহটির গতিবিধিতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন যে ইউরেনাসের চলার পথ অংকের হিসেব অনুযায়ী যা হওয়া উচিত তা নয়, একটু যেন গরমিল রয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে সময় ঐ গরমিলের কারণটা কি তা কারো মাথায় আসে নি। এর সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আরও 24 বছর পরে, 1845 সালে।

সমাধানটা খুঁজে পান দুজন গণিতবিদ্—একজন ইংলণ্ডের অধিবাসী, নাম জন অ্যাডামস্ John Adams। অপরজন ফ্রান্সের অধিবাসী, নাম আরবেইন লিভেরিয়ার (Urbain Leverrier)। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো এই যে, ঐ দুজন একে অপরের অজান্তেই প্রায় একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তাঁরা বললেন, ইউরেনাসের বাইরে কক্ষপথে কোনও অজ্ঞাত গ্রহ আছে যার টান ইউরেনাসের চলনে গোলমাল ঘটাচ্ছে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে সৌরমণ্ডলের প্রত্যেকটি গ্রহ বাকি প্রত্যেকটি গ্রহকে টানে। ঐ টানের পরিমাণ নির্ভর করে গ্রহদের নিজস্ব ভর এবং তাদের মধ্যেকার দূরত্বের ওপর। এর ফলে যে কোনও গ্রহের চলন অনেকটা নির্ভর করে ঐ গ্রহটির ওপর বাকি গ্রহগুলির সমষ্টিগত টানের ওপর। এই সূত্র অনুসারে ইউরেনাসের বেলায় সবচেয়ে বেশী টান পড়া উচিত বৃহস্পতির ও শনির। আসলে কিন্তু দেখা গেল যে তা নয়, ইউরেনাসের ওপর আরও কোনও একটা টান এসে পড়ছে যার ফলে এর গতিপথ অংকের হিসেবে যা হওয়া উচিত তা না হয়ে যেন একটু সরে যাচ্ছে।

অ্যাডাম্স্ ও লিভেরিয়ার দুজনেই ছিলেন গণিতবিদ্। তাঁরা অংক কষে নতুন গ্রহটির সন্ধান পেলেও বাস্তবে গ্রহটিকে তাঁরা কেউই দেখেন নি। ইউরেনাসকে প্রথম দেখবার কৃতিত্ব জার্মানীর বার্লিন মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী যোহান গ্যালীর (Johann Galle)।

1845 সালের নভেম্বর মাসে অ্যাডাম্স্ তাঁর নতুন গ্রহটি সংক্রান্ত গণনার ফলাফল ইংলণ্ডের রাজজ্যোতির্বিদ্ স্যার জর্জ অ্যারি (George Airy) কে পাঠিয়ে

তাঁকে গ্রহটিকে খুঁজে বের করতে অনুরোধ জানান। অ্যারি কিন্তু নিজে কিছুই করেন না। তিনি কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের অধ্যক্ষ জেমস চ্যালিস (James Challis) ঐ অনুসন্ধানের ভার দেন। চ্যালিস নাকি গ্রহটি খুঁজে পান না।

ওদিকে প্রায় একই সময়, লিভেরিয়ারও তাঁর গণনার ফলাফল প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর কাগজপত্র পাঠিয়ে দেন বার্লিনে যোহান গ্যালীর কাছে। কাগজপত্র গ্যালীর কাছে পৌছয় 1846 সালের 23 সেপ্টেম্বরে। সেদিন রাত্তিরেই গ্যালী তাঁর দূরবীনে লিভেরিয়ারের হিসেবমত নির্দিষ্ট জায়গাতেই অজ্ঞাত গ্রহটিকে দেখতে পেলেন। নতুন গ্রহটির নাম দেওয়া হলো নেপচুন (Neptune)।

নেপচুনের আসল আবিষ্কারক কে তা নিয়ে এক সময় যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। তবে এখন এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, এই সাফল্যে অ্যাডাম্স্ ও লিভেরিয়ার দুজনেরই কৃতিত্ব সমান। তবে আকাশে নেপচুনকে প্রথম খুঁজে বের করার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই গ্যালীর প্রাপ্য।

সূর্য থেকে নেপচুনের দূরত্ব প্রায় 450 কোটি কিলোমিটার। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে প্রায় 165 বছর।

গ্রহ হিসেবে নেপচুন বেশ বড়, প্রায় ইউরেনাসেরই সমান। এর ব্যাস প্রায় 49,500 কিলোমিটার (ইউরেনাসের ব্যাস 51,800 কিলোমিটার)। আয়তনে নেপচুন পৃথিবীর চেয়ে প্রায় 54 গুণ বড়, কিন্তু হাল্কা গ্যাসীয় পদার্থের তৈরী বলে এর ঘনত্ব খুবই কম, মাত্র 1·8। আর সেজন্যে পৃথিবীর তুলনায় নেপচুনের ভর মাত্র 17 গুণ বেশী।

পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণের ফলে গ্রহটির গঠন সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে গেছে তা থেকে মনে হয় নেপচুনের গঠনও ইউরেনাসের মতোই। দুটি গ্রহই জমাটবাঁধা গ্যাসের তৈরী। ইউরেনাসের মতো নেপচুনের বায়ুমণ্ডলেও প্রচুর পরিমাণে মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। আর ইউরেনাসের মতো নেপচুনের উপরিতলও খুবই ঠাণ্ডা। সেখানকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পাওয়া গেছে শূন্যের 165 ডিগ্রী সেলসিয়স নিচে।

দূরবীনে নেপচুনকেও ইউরেনাসের মতো হাল্কা সবুজ রঙের বৈশিষ্ট্যহীন গোলকের মতো দেখায়। আর সেজন্যেই গ্রহটির আহ্নিক গতির সম্বন্ধে সঠিক তথ্য আজও পাওয়া যায় নি। আগে মনে করা হত নেপচুন নিজের অক্ষে একবারে ঘোরে 15 ঘণ্টা 48 মিনিটে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, নিজের অক্ষে একবার ঘুরতে নেপচুনের সময় লাগে অনেক বেশী, 18 ঘণ্টা 16 মিনিট।

আজ পর্যন্ত নেপচুনের চারটি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড় উপগ্রহটির নাম ট্রাইটন (Triton), ব্যাস 3700 কিলোমিটার। উপগ্রহটি আবিষ্কার করেন ইংলণ্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়ম ল্যাসেল 1846 সালে, নেপচুনের আবিষ্কারের মাত্র 17 দিনের মধ্যে। নেপচুন থেকে ট্রাইটনের দূরত্ব প্রায় 3,55,000 কিলোমিটার। এই উপগ্রহটির বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এটি সাধারণ উপগ্রহগুলির মতো মূল গ্রহটি যেদিকে ঘোরে সেদিকে ঘোরে না, ঘোরে উল্টো মুখে। মানে, নেপচুনের চারপাশে ট্রাইটন ঘোরে পূব থেকে পশ্চিমে।

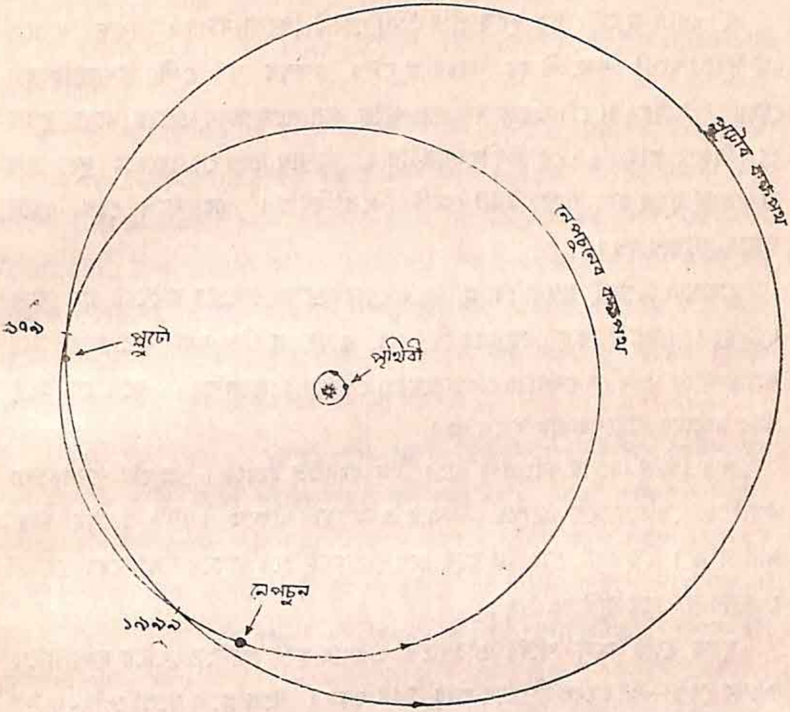
নেপচুনের দ্বিতীয় উপগ্রহটি খুবই ছোট, নাম নিরিইদ (Nereid)। এর ব্যাস মাত্র 300 কিলোমিটার। এটি আবিষ্কার করেন আমেরিকার জি পি কুইপার 1849 সালে। নেপচুন থেকে নিরিইদের গড় দূরত্ব হলো প্রায় 56 লক্ষ কিলোমিটার। কিন্তু এর কক্ষপথ ভীষণ রকমের উপবৃত্তাকার হওয়ার ফলে উপগ্রহটি কখনো চলে আসে গ্রহ থেকে মাত্র 13 লক্ষ 40 হাজার কিলোমিটারের মধ্যে, আবার কখনো চলে যায় গ্রহ থেকে প্রায় 98 লক্ষ কিলোমিটার দূরে।

তৃতীয় উপগ্রহটির সন্ধান পাওয়া যায় 1981 সালে। এটির ব্যাস সম্ভবতঃ 180 কিলোমিটার আর নেপচুন থেকে দূরত্ব 50,000 কিলোমিটার। চতুর্থ উপগ্রহটির দূরত্ব অনুমান করা হয়েছে 37,000 কিলোমিটার।

সম্প্রতি নেপচুনেরও নিজস্ব দুটি বলয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। সন্ধান পান আমেরিকার ভিলানোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী এড্ওয়ার্ড গিনান (Edward Guinan) 1968 সালে সংগ্রহ করা কিছু পুরানো তথ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে। সেবছর একটি তারার সামনে দিয়ে নেপচুনের পরিক্রমণের সময় ঐ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। এখানেও ব্যাপারটা ঠিক 1977 সালে ইউরেনাসের বলয় আবিষ্কারের মতো।

নেপচুনের বলয় দুটির ব্যাস অনুমান করা হয়েছে যথাক্রমে 56,000 কিলোমিটার ও 65,000 কিলোমিটার। বলয় দুটি চওড়ায় সম্ভবতঃ 2000 থেকে 2500 কিলোমিটারের মতো। তবে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পৃথিবীর থেকে পর্যবেক্ষণ করে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আগামী 1989 সালের শেষের দিকে ভয়েজার-2 গ্রহযানটির নেপচুনের কাছাকাছি পৌঁছবার কথা আছে। সেসময় নেপচুনের গঠন ও তার বায়ুমণ্ডল, তার উপগ্রহ ও বলয় সম্পর্কে অনেক তথ্য হয়তো আমরা পাবো।

নেপচুনের আবিষ্কারের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন যে, তাঁরা এবার



নেপচুন ও প্লুটোর কক্ষপথ।

সবকটি গ্রহের গতিবিধি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবেন। আসলে কিন্তু তা হলো না। দেখা গেল যে, সৌরমণ্ডলের বাইরের দিকের গ্রহগুলির চলাফেরায় কিছু গরমিল থেকে যাচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সন্দেহ হলো, হয়তো নেপচুনের বাইরেও কোনও অজ্ঞাত গ্রহ আছে যার টানের ফলেই ঐ গরমিল রয়ে যাচ্ছে। শুরু হলো খোঁজ।

1915 সালে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী পার্সিভাল লোয়েল অজ্ঞাত গ্রহটি কোথায় দেখতে পাওয়া যাবে সে বিষয় তথ্য প্রকাশ করলেন। কিন্তু সেসময় অনেক শক্তিশালী দূরবীনেও গ্রহটিকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। তার সন্ধান পাওয়া যায় লোয়েলের মৃত্যুর 14 বছর পর, 1930 সালে। সেবছর ফেব্রুয়ারি মাসের 18 তারিখে লোয়েল মানমন্দির থেকে তোলা ছবিতে গ্রহটিকে খুঁজে বের করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লাইড টমবাউ (Clyde Tombaugh)। নতুন গ্রহটির আবিষ্কার ঘোষণা করা হয় 13 মার্চ, নাম রাখা হয় প্লুটো (Pluto)।

সূর্য থেকে প্লুটোর গড় দূরত্ব প্রায় 590 কোটি কিলোমিটার। কিন্তু আসলে এই দূরত্বে যথেষ্ট কমবেশী হয়, কারণ প্লুটোর কক্ষপথ খুব বেশী উপবৃত্তাকার। যেমন ধরো, যখন প্লুটো সূর্যের সবচেয়ে কাছে এসে পড়ে তখন তাদের মধ্যে দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় প্রায় 443 কোটি কিলোমিটার। আবার যখন সে সবচেয়ে দূরে চলে যায় তখন দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় 740 কোটি কিলোমিটার। এর ফলে বেশ একটা মজার ব্যাপার হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, প্লুটোকে সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বাইরের গ্রহ বলে ধরা হয়। কথাটা কিন্তু একেবারে ঠিক নয়, কারণ প্লুটো যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে আসে তখন সে নেপচুনের কক্ষপথেরও ভেতরে চলে আসে। ফলে সে তখন আর সবচেয়ে বাইরের গ্রহ থাকে না।

গত 1979 সালের জানুয়ারি মাসে ঠিক এমনটিই হয়েছে। প্লুটো নেপচুনের কক্ষপথের ভেতরে চলে এসেছে। আর এ অবস্থা থাকবে 1999 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। সুতরাং প্রায় 20 বছর ধরে নেপচুনই হয়ে থাকবে আমাদের সৌর-মণ্ডলের সবচেয়ে বাইরের গ্রহ।

দূরত্ব বেশী বলে সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে প্লুটোর সময় লাগে অনেক বেশী—আমাদের হিসেবে প্রায় 248 বছর। ফলে প্লুটো হলো সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে মন্থর গ্রহ। কক্ষপথে এর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র 4·7 কিলোমিটার। সে তুলনায় আমাদের পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 30 কিলোমিটার বেগে এগিয়ে যাচ্ছে।

গ্রহ হিসেবে প্লুটো খুবই ছোট। সর্বাধুনিক হিসেবে গ্রহটির ব্যাস হয়তো 3000 কিলোমিটারের বেশী নয়। তবে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বুঝতেই পারছ, অত ছোট গ্রহটিকে এত দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করে খুব বেশী কিছু জানা সম্ভব নয়। তবে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয়, প্লুটোর উপরিতল জমাট বাঁধা মিথেন গ্যাসে ঢাকা। সেখানকার তাপমাত্রা পাওয়া গেছে শূন্যেরও 220 ডিগ্রী সেলসিয়স নিচে।

কিছু দিন আগে পর্যন্ত মনে করা হত যে, প্লুটোর কোনও উপগ্রহ নেই। কিন্তু এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। 1978 সালের জুলাই মাসে আমেরিকার নৌসৈনিক মানমন্দির থেকে তোলা ছবিতে উপগ্রহটির সন্ধান পান জে ডব্লিউ ক্রিস্টি (J. W. Christy)।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্লুটোর উপগ্রহটি বেশ বড়। এর ব্যাস হয়তো 1000

থেকে 1200 কিলোমিটারের মধ্যে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। প্লুটোর ব্যাস যদি 3000 কিলোমিটার হয়, তবে সে তুলনায় তার উপগ্রহটি খুবই বিশাল বলতে হবে। উপগ্রহটির কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকার, ব্যাস প্রায় 40,000 কিলোমিটার।

প্লুটোর আকার ও গঠন দেখে অনেক বিজ্ঞানী মনে যে, প্লুটো আসলে কোনও গ্রহ নয় বরং নেপচুনের কোনও কক্ষচ্যুত উপগ্রহ। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle)-এর ধারণা—প্লুটো ও ট্রাইটন এক সময় নেপচুনের উপগ্রহ ছিল, কিন্তু কোনও কারণে তারা নিজ নিজ কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে আসে। ট্রাইটন নেপচুনের উপগ্রহই রয়ে যায়, কিন্তু তার চলনের দিক পরিবর্তন হয়ে যায়। প্লুটো বেরিয়ে গিয়ে সূর্যের গ্রহ হয়ে যায়। হয়তো এই কারণেই আজও প্লুটোর কক্ষপথ নেপচুনের কক্ষপথের ভেতরে চলে আসে।

প্লুটোর পর তোমরা হয়তো প্রশ্ন করবে, সৌরমণ্ডলে কি আর কোনও গ্রহ আছে? এ প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ আজ যা অজানা রয়েছে ভবিষ্যতে হয়তো তার সন্ধান মিলতে পারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সৌরমণ্ডল সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় প্লুটোর বাইরে আর কোনও গ্রহ নেই। তবে গত দশকে দু' একবার এ নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে বেশ চাঞ্চল্য দেখা গেছে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে 1972 সালে। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতবিদ্ যোসেফ ব্র্যাডি (Joseph Brady) এবং এড্না কার্পেণ্টার (Edna Carpenter) বিখ্যাত হ্যালির ধূমকেতুর গতিবিধি সম্পর্কে গণনা করতে গিয়ে দেখলেন যে, তার মধ্যে কিছু গরমিল দেখা যাচ্ছে। তাঁরা ঘোষণা করলেন, প্লুটোর বাইরে নিশ্চয়ই কোনও গ্রহ আছে যার টানের ফলে ঐ গরমিল হচ্ছে। তাঁরা অজ্ঞাত গ্রহটির নাম রাখলেন 'প্ল্যানেট্-এক্স' (Planet-X)। ব্র্যাডি ঐ গ্রহটির সম্ভাব্য আয়তন এবং প্রদক্ষিণ কালেরও একটা আন্দাজ দেন। তিনি জানান যে, সৌরমণ্ডলের দশম গ্রহটি প্রায় বৃহস্পতির মতোই বিশাল। সূর্য থেকে প্রায় 920 কোটি কিলোমিটার দূরে কক্ষপথে এটি প্রায় 464 বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ব্র্যাডির 'প্ল্যানেট এক্স'-এর সন্ধান পাওয়া যায় নি।

দ্বিতীয় বার দশম গ্রহ নিয়ে হৈচৈ হয় 1977 সালে। সে বছর অক্টোবর মাসে আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী চার্লস কোআল (Charles Kowal) সূর্যের

কক্ষপথে একটি গ্রহের মতো বস্তুর সন্ধান পান, যার নাম রাখা হয় 'চিরণ' (Chiron)। এটিকে প্রথমে সৌরমণ্ডলের দশম গ্রহ বলেই অভিহিত করা হয়েছিল। কিন্তু পরে জানতে পারা গেছে যে, এটি সম্ভবত ধূমকেতু বা গ্রহাণু জাতীয় বস্তু, যার আনুমানিক ব্যাস কয়েক শ' কিলোমিটার মাত্র। চিরণের কক্ষপথ গণনা করে দেখা গেছে যে, এটি একটি উপবৃত্তাকার পথে শনি ও ইউরেনাসের মাঝখানে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তবে এর কক্ষপথ স্থির নয়।

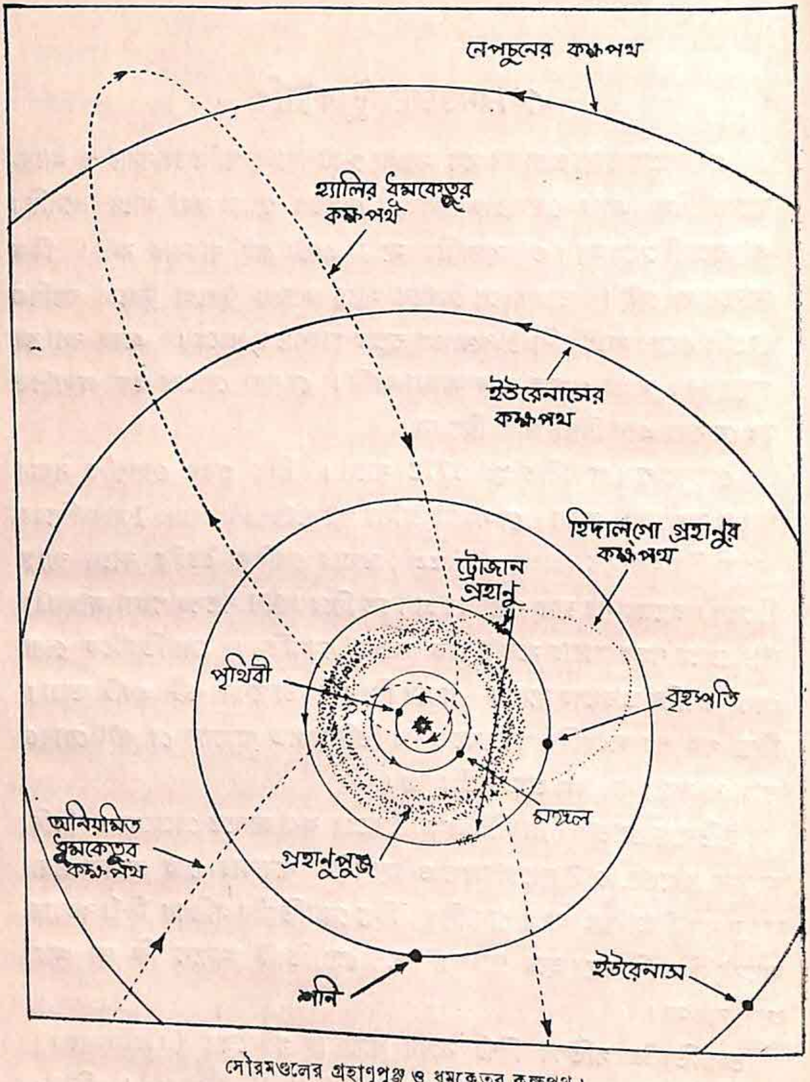
সৌরমণ্ডলের টুকিটাকি

গ্রহউপগ্রহ ছাড়াও সৌরমণ্ডলে অসংখ্য ছোট ছোট বস্তুপিণ্ডের সমাবেশ আছে, যাদের বিষয় এবার তোমাদের বলব। বোডের সূত্রের কথা আগেই বলেছি। এই সূত্র হিসেবে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে একটা গ্রহ থাকবার কথা। কিন্তু আসলে তা নেই। তার বদলে সেখানে আছে অসংখ্য টুকরো টুকরো বস্তুপিণ্ড যেগুলি গ্রহের মতই নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। এদের বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ। অবশ্য এ খবর আজ আমরা জানি। যে সময় বোডের সূত্র প্রকাশিত হয় সে সময় এসব কিছুই জানা ছিল না।

বোডের সূত্র প্রকাশিত হয় 1772 সালে। কিন্তু প্রথম গ্রহাণুটির সন্ধান পাওয়া যায় 1801 সালে। সে সময় ইতালির পালের্মো (Palermo) মানমন্দিরের অধ্যক্ষ পিয়াৎসি (Giuseppe Piazzi) তারার তালিকা তৈরীর কাজে ব্যাস্ত ছিলেন। রাতের পর রাত পর্যবেক্ষণ চালাতে গিয়ে 1801 সালের পয়লা জানুয়ারী তাঁর চোখে পড়ল তারার মতোই এক অচেনা জ্যোতিষ্ক। জ্যোতিষ্কটিকে দেখা গেল বৃষরাশির তারাদের মধ্যে। প্রথমে পিয়াৎসি ভাবলেন ওটি একটি তারা। কিন্তু পর পর কয়েকদিন পর্যবেক্ষণের পর তিনি বুঝতে পারলেন যে ওটা কোনও তারা বা নক্ষত্র নয়, বরং গ্রহ জাতীয় বস্তু।

ইতিমধ্যে বোড'ও পিয়াৎসীর ঐ আবিষ্কারের কথা জানতে পেরেছেন। তিনি অনুমান করলেন, ওটই হয়তো মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যেকার সেই অজানা গ্রহ, যার সন্ধান বিজ্ঞানীরা আগে পান নি। কিন্তু জ্যোতিষ্কটির গতিপথ নির্ণয় করবার আগেই পিয়াৎসি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে জ্যোতিষ্কটি আসলে কি তা আর জানা যায় না।

জ্যোতিষ্কটির গতিপথ নির্ণয় করেন জার্মানীর গটিনজেন (Gottingen) বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতজ্ঞ কার্ল ফ্রেডরিক গাউস (Karl F. Gauss)। পিয়াৎসির কয়েক দিনের পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্য নিয়ে অঙ্ক কষে গাউস ঘোষণা করলেন যে, জ্যোতিষ্কটি আসলে কোনও তারা নয়, গ্রহ। গাউসের গণনা হিসেবে নির্দিষ্ট জায়গায় জ্যোতিষ্কটিকে আবার দেখতে পাওয়া গেল প্রায় এক বছর পর, 1801 সালের ডিসেম্বর মাসে। তার নাম দেওয়া হলো 'সিরিস' (Ceres)। সূর্য থেকে সিরিসের দূরত্ব পাওয়া গেল প্রায় 40 কোটি 30 লক্ষ কিলোমিটার,



সৌরমণ্ডলের গ্রহাণুপুঞ্জ ও ধূমকেতুর কক্ষপথ।

মানে বোডের সূত্র হিসেবে যেখানে অজানা গ্রহটি থাকবার কথা ঠিক সেখানেই। বিজ্ঞানীরাও প্রায় এটাই মেনে নিলেন। কিন্তু গোলমাল বাধলো গ্রহটির আয়তন নিয়ে। পর্যবেক্ষণের ফলে জানতে পারা গেল যে, সিরিসের ব্যাস মাত্র 6000 কিলোমিটারের কিছু বেশী। ওদিকে সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে ছোট গ্রহ বুধের ব্যাস হলো এর প্রায় পাঁচ গুণ বেশী। সুতরাং সৌরমণ্ডলের বাকি গ্রহগুলির

পাশে এটিকে কিছুতেই গ্রহ বলে ভাবা যায় না। তা হলে এটা কি? জানবার জন্যে আরও অনুসন্ধান চলতে লাগলো।

1802 সালের মার্চ মাসে সূর্য থেকে প্রায় একই দূরত্বে আরও একটি ছোট গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেল। ব্যাস মাত্র 600 কিলোমিটার। নাম রাখা হলো 'পালাস' (Pallas)। এর পরের পাঁচ বছরে প্রায় একই কক্ষপথে খুঁজে পাওয়া গেল আরও দুটি ছোট গ্রহকে। নাম দেওয়া হলো 'জুনো' (Juno) ও 'ভেস্তা' (Vesta)। জুনোর ব্যাস 190 কিলোমিটার, ভেস্তার প্রায় 550 কিলোমিটার।

একই কক্ষপথে একসঙ্গে এতগুলি 'গ্রহ' আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে সেগুলি গ্রহ নয়। আয়তনে খুবই ছোট হওয়ার দরুন এদের 'গ্রহাণু' বলাটাই ঠিক হবে। সমষ্টিগতভাবে এদের বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ।

পঞ্চম গ্রহাণু 'অ্যাস্ট্রীয়া' (Astraea)-র সন্ধান পাওয়া গেল 1845 সালে। 1847 সালে আরও তিনটির সন্ধান পাওয়া গেল। এর পর প্রায় প্রতি বছরই কয়েকটা গ্রহাণু আবিষ্কৃত হতে লাগলো। এইভাবে 1890 সালের মধ্যে আবিষ্কৃত গ্রহাণুর সংখ্যা হয়ে দাঁড়ালো প্রায় তিনশো। কিন্তু এর পর চোখে দেখে গ্রহাণু আবিষ্কার করাটা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। কারণ বড় গ্রহাণুগুলি ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করা হয়ে গেছে। যারা বাকি রয়ে গেছে তারা সব কটিই খুব ছোট।

এই সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল 1891 সালে বিশেষ ধরণের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে। ঐ সব ক্যামেরায় তোলা ছবিতে গ্রহাণু লম্বা রেখার মতো দেখায় ফলে তাদের চিনতে অসুবিধা হয় না। এইভাবে তোলা ছবিতে পরবর্তীকালে ঝাঁকে ঝাঁকে গ্রহাণুর সন্ধান পাওয়া যেতে লাগলো। ফলে আজ পর্যন্ত প্রায় দু'-হাজার গ্রহাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে কক্ষপথে প্রায় এক লক্ষেরও বেশি গ্রহাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যত বেশি গ্রহাণুর সন্ধান পাওয়া যেতে লাগলো, তাদের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা নাম দেওয়াটা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। গোড়ার দিকে দেওয়া হত পৌরাণিক দেবতাদের নাম, তারপরে আসতে লাগলো খ্যাতনামা জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীদের নাম, ফুলের নাম, বিখ্যাত শহরের নাম, মহিলাদের নাম, বন্দরের নাম, জাহাজ কোম্পানীর নাম, এমন কি মিষ্টান্নের নামে পর্যন্ত গ্রহাণুর নাম রাখা হয়েছে। পরে অবশ্য কেবলমাত্র সংখ্যা দিয়েই গ্রহাণুর নামকরণ করা শুরু হয়।

গ্রহাণুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় চারটি হলো সিরিস, পালাস, ভেস্তা এবং হাইজিয়া (Hygeia)। এদের ব্যাস যথাক্রমে 1003 কিলোমিটার, 608 কিলোমিটার, 538 কিলোমিটার এবং 450 কিলোমিটার। বাকি গ্রহাণুগুলির বেশীর ভাগই খুবই ছোট, হয়তো বড়ো পাথরের টুকরোর মতো আকারের। একটা অনুমান হিসেবে সৌরমণ্ডলের সব কটি গ্রহাণুকে যদি একসঙ্গে জড়ো করা হয়; তবে তাদের মোট আয়তন আমাদের চাঁদের আয়তনের চেয়ে কম হবে। কিন্তু অত ছোট হলে কি হবে, প্রতিটি গ্রহাণু গ্রহের মতোই নিজের অক্ষে পাক খেতে খেতে নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে।

বেশী ভাগ গ্রহাণুর কক্ষপথ বৃত্তাকার। কিন্তু সূর্য থেকে সব দূরত্বে এদের সমাবেশ একরকম নয়, কোথাও কম কোথাও বেশী। বলা যেতে পারে যে, গ্রহাণুগুলি কয়েকটি আলাদা আলাদা ঝাঁকে বিভিন্ন দূরত্বে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে, অনেকটা যেন ইউরেনাসের বলয়ের মতো।

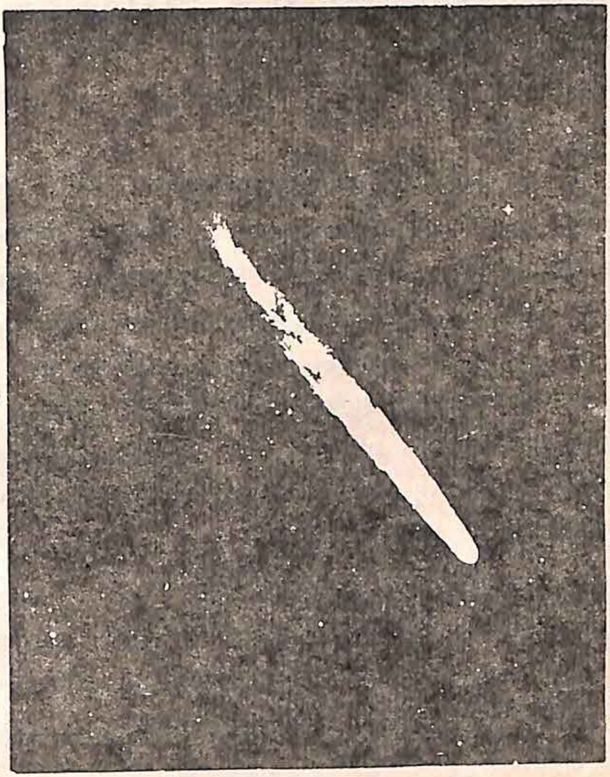
কিছু গ্রহাণুর চলন আবার অদ্ভুত। এদের কক্ষপথ এত বেশি উপবৃত্তাকার যে এরা কখনও শনিগ্রহের কাছাকাছি চলে যায়। আবার কখনও বুধগ্রহের কক্ষেরও ভিতর চলে আসে। আবার একদল গ্রহাণু আছে যারা বৃহস্পতির আগু-পিছু একই কক্ষে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। এদের বলা হয় ট্রোজান (Trojan)।

অবশ্য এই আনাগোনার সময় কোন গ্রহাণুর পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা খুবই কম। বলা যেতে পারে কোটিতে এক। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যে গ্রহাণুটি এসেছে তার নাম হলো হারমিস্ (Hermes)। 1983 সালের জানুয়ারী মাসে গ্রহাণুটিকে দেখা যায় পৃথিবী থেকে প্রায় 7 লক্ষ 76 হাজার কিলোমিটার দূরে।

গ্রহাণুপুঞ্জের উৎপত্তি কি করে হলো তা নিয়ে অনেক মত আছে। কিছু বিজ্ঞানীর ধারণা এগুলি কোন একটি আস্ত গ্রহের ভগ্নাবশেষ মাত্র। আবার অনেকে মনে করেন, এগুলি সৌরমণ্ডলের যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকেই এভাবে আছে। হয়তো কোনও বিশেষ কারণে পুরো গ্রহের আকারে জোট বাঁধতে পারে নি।

ধূমকেতু

গ্রহ-উপগ্রহ ও গ্রহাণুপুঞ্জ ছাড়াও সৌরমণ্ডলে আর যা আছে তা হলো ধূমকেতু ও উল্কা। এদের মধ্যে আকারে এবং আচরণে সবচেয়ে অদ্ভুত হলো ধূমকেতু।



হ্যালির ধূমকেতু। এটিকে আবার 1985-86 সালে দেখা যাবে।

আকাশে এদের বিরাট ল্যাজওয়ালা তারার মতো দেখায় কিন্তু এদের আবির্ভাব খুবই অনিয়মিত।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ ধূমকেতু দেখে আসছে। আগেকার কালে আকাশে ধূমকেতু দেখা গেলে মনে করা হত যুদ্ধ বা মড়ক হতে চলেছে। কিন্তু আজ আমরা জানি যে, এরকম ধারণার কোনও যুক্তি নেই। ধূমকেতুর আবির্ভাব কেবলমাত্র একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, এর সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের ভবিষ্যতের কোনও যোগাযোগ নেই।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, ধূমকেতু আসলে হলো বরফ জাতীয় বস্তুর ছোট ছোট কতকগুলো টুকরো যা বিভিন্ন কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। অবশ্য সাধারণ গ্রহের সঙ্গে এর চলার পথের অনেক তফাৎ

আছে। যেমন ধরো যে, কোন গ্রহের তুলনায় ধূমকেতুর কক্ষপথ অনেক বেশী রকমের লম্বাটে উপাবৃত্তাকার। তার কক্ষতলও অনেক বেশী হেলানো। আবার এমন ধূমকেতুও আছে যাদের চলাটা উলটো দিক দিয়ে। মানে গ্রহগুলো যেদিকে চলে তার উল্টো দিকে।

আগে মনে করা হত যে, বেশীর ভাগই ধূমকেতুই সৌরমণ্ডলের বাইরে থেকে আসে। কিন্তু আসলে তা নয়। ওরকম মনে হওয়ার কারণ হলো ধূমকেতুর কক্ষপথের আকার। ধূমকেতুর কক্ষপথ প্রধানত দু'রকমের হয়। একরকম হচ্ছে অধিবৃত্তাকার। এরকম কক্ষপথে যেসব ধূমকেতু ঘোরে তাদের সাধারণত একবারই দেখতে পাওয়া যায়। আরেক রকমের কক্ষপথ হলো উপবৃত্তাকার। এরকম কক্ষপথে যে সমস্ত ধূমকেতু আছে তাদের নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে ফিরে আসতে দেখা যায়। বিখ্যাত হ্যালির ধূমকেতু (Halley's comet) হলো এ ধরনের একটি নিয়মিত ধূমকেতু। এটিকে গতবার দেখা গিয়েছিল 1910 সালে, আবার দেখা যাবে 1986 সালে।

আকাশে ধূমকেতুর প্রধান লক্ষণ হলো এর উজ্জ্বল ল্যাজ। ঐ ল্যাজ কিন্তু সব সময় থাকে না। যখন কক্ষপথে চলতে চলতে ধূমকেতু সূর্যের কাছাকাছি চলে আসে তখন সূর্যের তাপে ধূমকেতুর দেহ থেকে গ্যাস ও ধূলোর কণা বেরিয়ে এসেই ঐ ল্যাজের সৃষ্টি হয়। আবার সূর্য থেকে ধূমকেতু যত দূরে চলে যায় তার ল্যাজও ছোট হতে থাকে আর এক সময় অদৃশ্য হয়ে যায়।

এখানে একটা মজার কথা তোমাদের বলে রাখি। ধূমকেতুর গতি যে মুখোই হোক না কেন তার ল্যাজ কিন্তু সব সময়েই সূর্যের উল্টো দিকে থাকে। মানে ধূমকেতু যখন সূর্যের দিকে আসছে তখন তার ল্যাজ থাকে পিছনের দিকে। আবার ধূমকেতু ঘুরে যখন সূর্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তখন ল্যাজটি থাকে সামনের দিকে।

উল্কা

রাতের আকাশে 'তারা খসা' কি তা নিশ্চয়ই তোমরা জানো। কখনও কখনও মনে হয় হঠাৎ যেন একটা তারা ছুটে চলে গেল। আসলে কিন্তু ওগুলো তারা নয়। ওগুলো হলো খুব ছোট ছোট বস্তুকণা যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে জলে ওঠে। ওদেরই বলা হয় উল্কা। বেশীর ভাগ উল্কাই বায়ুমণ্ডলে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কখনও কখনও বড় আকারের উল্কাপিণ্ড মাটিতে এসে পড়ে।

ধূমকেতুর সঙ্গে উল্কার বিশেষ সম্পর্ক আছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা ধূমকেতুর ল্যাজ থেকেই উল্কার সৃষ্টি হয়। কারও মতে পৃথিবী যখন পুরানো কোনও ধূমকেতুর কক্ষপথের ভেতর দিয়ে চলে যায় তখনই বেশীর ভাগ উল্কা দেখতে পাওয়া যায়।

কখনও কখনও উল্কাপিণ্ড এত বড় হয় যে, তা মাটিতে পড়ে প্রকাণ্ড গর্ত করে দেয়। পৃথিবীর ওপর উল্কাপিণ্ড পড়ে সবচেয়ে বড় গর্ত তৈরী হয়েছে আমেরিকার আরিজোনায়। এর ব্যাস 1180 মিটার, গভীরতা 175 মিটার। অবশ্য এত বড় উল্কাপিণ্ড পড়ার ঘটনা খুবই বিরল। বেশির ভাগ সময়েই ছোট-খাটো পাথরের টুকরোর মতো উল্কাপিণ্ড পড়তে দেখা যায়।

মাটিতে যে সব উল্কাপিণ্ড এসে পড়ে সেগুলি কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। কারণ ঐসব উল্কাপিণ্ডের অধ্যয়ন করে তাঁরা সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি এবং তার অতীতের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পেয়েছেন। এমন কি, কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন যে ঐ উল্কাপিণ্ডের বিশ্লেষণ করে তাতে এমন সব জৈব রাসায়নিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে যা থেকে জীবের উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকতে পারে।

সৌর মণ্ডলের উৎপত্তি

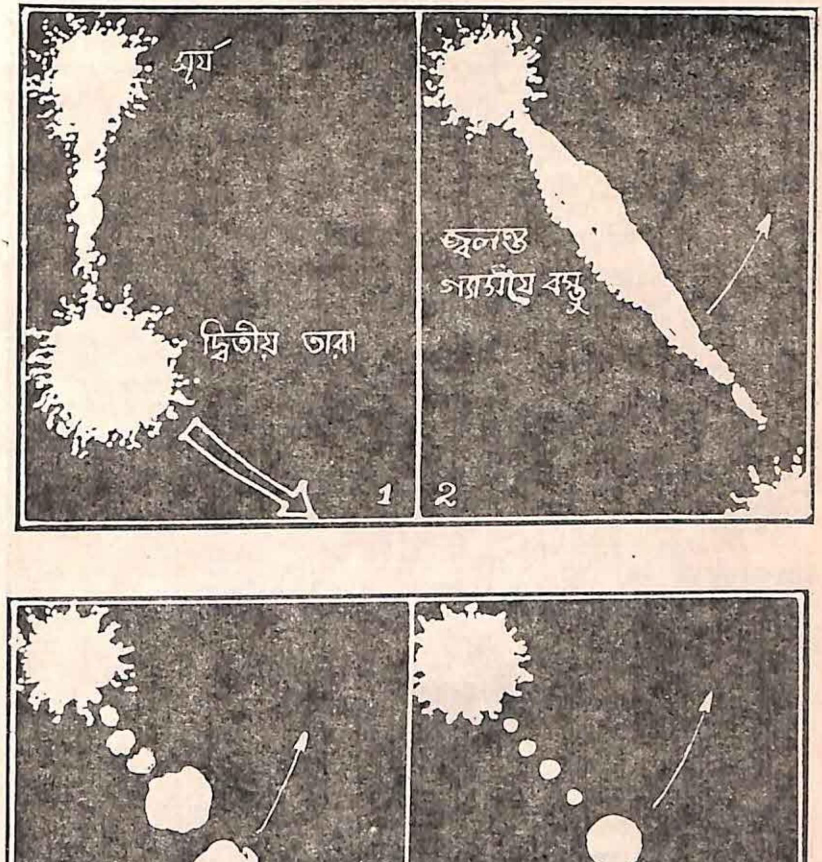
এতক্ষণ তোমাদের যা বললাম তা হলো সৌরমণ্ডলের বর্তমান অবস্থার বিষয়। মানে, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি পরিবেষ্টিত আমাদের সূর্যের পরিবারের বিষয়। কিন্তু চিরকাল কি এমনটি ছিল? আমরা জানি আমাদের পৃথিবীর বয়স 470 কোটি বছরের বেশী নয়। সৌরমণ্ডলের বাকি গ্রহের বেলায়ও তাই। তাহলে 470 কোটি বছরের আগে কি ছিল? কোথা থেকে এলো আমাদের সৌরমণ্ডল?

আর একটা কথা। আগে বলেছি যে আমাদের সূর্য হলো মাঝারী সাইজের একটি তারা। আকাশে সূর্যের মত অসংখ্য তারা আছে। তাদের কি নিজস্ব গ্রহমণ্ডল আছে? সূর্য ছাড়া আর কোনও তারার নিজস্ব গ্রহমণ্ডল আছে কি না তা আমাদের সঠিক জানা নেই। কারণটা আর কিছুই নয়, তারাদের দূরত্ব। পৃথিবী থেকে ঐ দূরত্ব এত বেশী যে সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীনেও সেখানে গ্রহের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। মহাকাশযান পাঠালে তা পৌঁছতে লাগবে হয়ত কয়েক শ' বছর। সুতরাং এ বিষয়ে এখনই সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়।

তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা যে মহাকাশের হাজার হাজার তারার নিশ্চই গ্রহ মণ্ডল আছে। দূরবীনে কোনও কোনও তারার চলাফেরায় হেরফের দেখে মনে হয় যে সেগুলির ওপর যেন অদৃশ্য কিছুর টান পড়ছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন ঐ টান নিশ্চই সে সব তারার নিজস্ব গ্রহ মণ্ডলের।

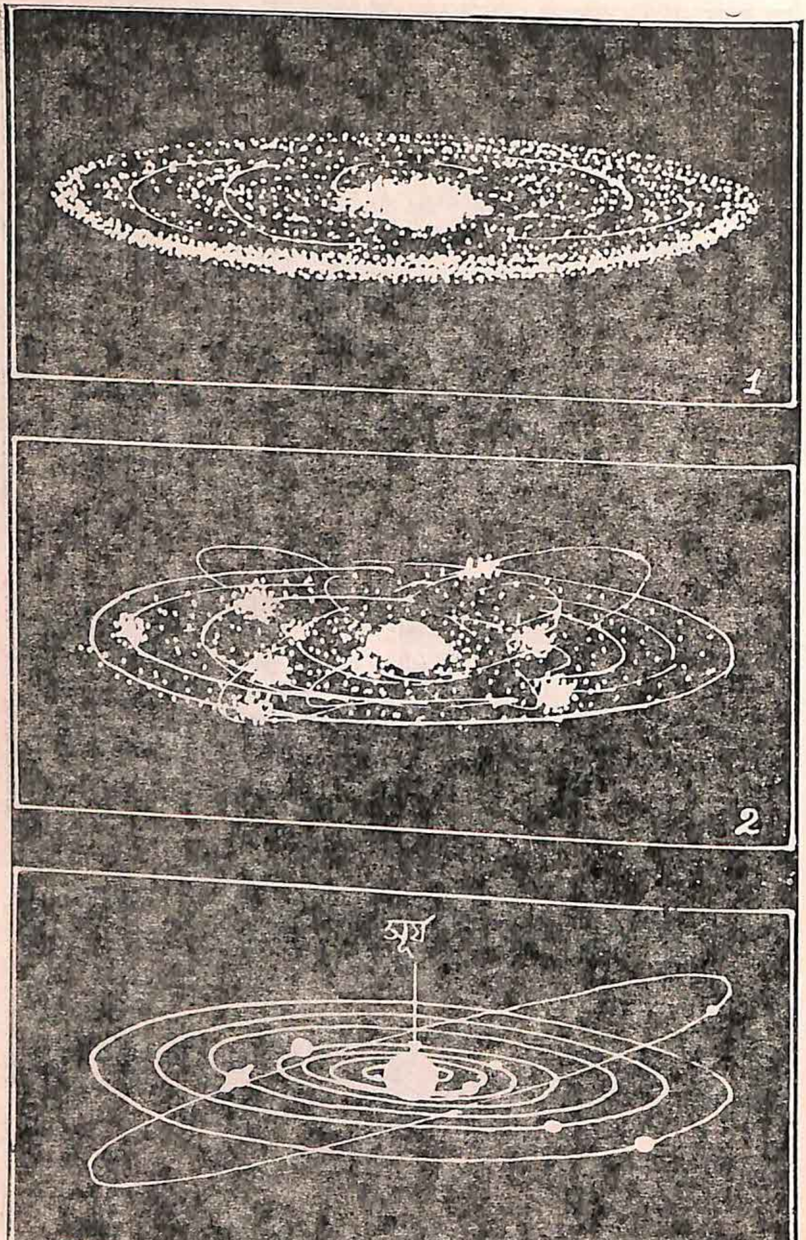
এখানে একটা কথা বলে রাখি। মহাশূন্যে আমাদের সূর্যও তার গ্রহ উপগ্রহকে নিয়ে একটা নির্দিষ্ট দিক অভিমুখে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে, যদিও তা আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই না। যদি বহু দূরের কোনও তারার কাছ থেকে সূর্যের গতির অধ্যয়ন করা হয় তবে দেখা যাবে যে তার চলনের ওপর সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির টানের প্রভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। মানে ঐ টানের দরুন সূর্যের গতিতে সামান্য হেরফের চোখে পড়বে।

যাই হোক, এখানে প্রশ্ন হলো - আমাদের সৌরমণ্ডল এলো কোথা থেকে? সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি নিয়ে গত 300 বছরে নানা মত প্রচারিত হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে দুটি মত খুব বেশী প্রচলিত ছিল। প্রথমটি হলো এই যে সৌরমণ্ডলের আবির্ভাবের আগেও সূর্য বিদ্যমান ছিল। কোনও এক সময় সূর্যের কাছ দিয়ে অন্য একটি তারা পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় সে তারাটির টানে সূর্যের গা



সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড থেকে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি।

থেকে বেরিয়ে আসা জলন্ত গ্যাসীয় বস্তু থেকেই আমাদের সৌরমণ্ডলের জন্ম। এই মত অনুসারে সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলি প্রথমে ছিল জলন্ত গ্যাসীয় অবস্থায়। পরে ঠাণ্ডা হতে হতে তাদের উপরিতল জমাট বেঁধেছে (অবশ্য বৃহস্পতি ও শনির বেলায় ব্যাপারটা অন্যরকম)।



গ্যাস ও ধূলিকণার মেঘ থেকে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই মতটিকে অনেকেই সত্যি বলে মানতেন। কিন্তু গত কয়েক দশকের অনুসন্ধান ও মহাকাশ অভিযানের ফলে এমন অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেছে যা থেকে মনে হয় এ ধারণা ভুল। এখন বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে আমাদের সূর্য ও সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি হয়েছিল একই সময় একই বিশাল গ্যাসীয় পিণ্ড থেকে। মানে আমাদের সূর্যের বয়েস আর সৌরমণ্ডলের গ্রহদের বয়েস প্রায় একই—আনুমানিক 47ｊ কোটি বছর। এই মত অনুসারে গ্রহউপগ্রহের উৎপত্তি হয় ঠাণ্ডা অবস্থাতেই, ধুলিকণা জমে।

470 কোটি বছর আগে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি কি করে হয় তার একটা সম্ভাব্য ছবিও বিজ্ঞানীরা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন । তাঁদের ধারণা প্রথমে ছিল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস এবং ধুলোর তৈরী বিশাল মেঘ। মহাকর্ষ বলের দরুণ ঐ মেঘের সংকোচনের ফলে আজ থেকে প্রায় 480 কোটি বছর আগে আমাদের সূর্য তার প্রাথমিক রূপ নিতে শুরু করে যার নাম দেওয়া হয়েছে Protc-sun। ঐ প্রোটো-সান কিন্তু তখনও পুরোপুরি সূর্যের রূপ নেয়নি। সেটা হয় আরও পরে, যখন সংকোচনের চাপে তার ভেতরের তাপ-পারমাণবিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

প্রায় একই সঙ্গে নবজাত সূর্যের বাইরে সে সময় আর একটা ঘটনা ঘটছিল। সূর্যকে ঘিরে চাকতির মত গ্যাস ও ধুলোর মেঘের মধ্যে জন্ম নিচ্ছিল আমাদের গ্রহগুলির আদিম রূপ। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। চাকতির মত মেঘটার ঘোরার ফলে তার মধ্যেকার ধুলিকণাগুলো ক্রমশঃ একে অন্যের সঙ্গে মিলে গ্রহাণুর মত ছোট ছোট পিণ্ডের আকার ধারণ করছিল। আবার সেগুলি মিলে ক্রমশঃ আরও বড় পিণ্ডের রূপ নিচ্ছিল। সবে মিলে সে সময় আমাদের সৌরমণ্ডলের একটা আবছা ছবি যেন ধীরে ধীরে ফুটে উঠছিল। এই ভাবে কিছুকাল চলতে চলতেই শেষ পর্যন্ত আমাদের সৌরমণ্ডল তার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছয়।

এখানে একচা কথা কিন্তু মনে রেখ। তা হলো এই যে, সৌরমণ্ডলের উৎপত্তির এই ছবিটাও কিন্তু নেহাতই কাল্পনিক, যদিও এটা বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতেই আঁকা। সৌরমণ্ডলের বিষয় অনেক জিনিষ আজও অজানা রয়ে গেছে যার উত্তর এ ছবি থেকে পাওয়া যায় না। যেমন ধরো, বিভিন্ন গ্রহের আয়তন। আজও আমরা জানি না বুধ কেন অত ছোট, বৃহস্পতি কেন অত বড়। আরও জানি না, গ্রহদের মধ্যেকার দূরত্বের কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আছে কি না; বা শুক্র কেন উল্টোদিকে পাক খায়। এসব প্রশ্নের উত্তর আজ আমরা জানি না। হয়ত তোমরা যখন বড় হবে ততদিনে জানতে পেরে যাবে।

সৌরমণ্ডল

গ্রহ	ব্যাস (কিলোমিটার)	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (লক্ষ কি. মি.)	সূর্য প্রদক্ষিণ কাল	কক্ষপথে গতিবেগ (কি. মি. প্রতি সেকেণ্ডে)	আয়তন (পৃথিবী = 1)	উপগ্রহ সংখ্যা
বুধ	4,880	579	88 দিন	47·9	0·06	0
শুক্র	12,104	1082	224·7 দিন	35	0·88	0
পৃথিবী	12,756	1496	365·25 দিন	29·8	1	1
মঙ্গল	6,787	2279	687 দিন	24·1	0·15	2
বৃহস্পতি	1,42,800	7783	11·86 বছর	13·1	1316	14
শনি	1,20,000	14270	29·46 বছর	9·6	755	17
ইউরেনাস	51,800	28696	84 বছর	6·8	67	5
নেপচুন	49,500	44966	164·8 বছর	5·4	57	4
প্লুটো	6000	59000	247·7 বছর	4·7	0·1	1

যে সব মানুষ চাঁদে গিয়েছেন

চন্দ্রযান	চাঁদের কক্ষে ছিলেন	চাঁদের ওপর নেমেছেন
1. অ্যাপোলো-11	মাইকেল কলিনস্	নীল আর্মস্ট্রং এবং এডুইন অ্যালড্রিন।
2. অ্যাপোলো-12	রিচার্ড এফ গর্ডন	চার্লস্ কনর্যাড্ এবং অ্যালান এল বীন।
3. অ্যাপোলো-14	স্টুয়ার্ট এ রুজা	অ্যালান বি শেপার্ড এবং এডগার বি মিচেল।
4. অ্যাপোলো-15	আলফ্রেড বি ওয়ার্ডেন	ডেভিড আর স্কট এবং জেমস বি আরউইন।
5. অ্যাপোলো-16	টমাস কে ম্যাটিংলে	জন ডবলু ইয়ং এবং চার্লস এম ডিউক।
6. অ্যাপোলো-17	রোনাল্ড ই ইভান্স	ইউজিন এ সেরনান এবং হ্যারিসন এইচ স্মিট।

বৃহস্পতির উপগ্রহ

উপগ্রহ সংখ্যা*	নাম	আবিষ্কারের তারিখ	ব্যাস	দূরত্ব	কক্ষপথ পরিক্রমণ সময়
14	—	1979	30-40 কি মি.	1,25,000 কি. মি.	7 ঘণ্টা 8 মিনিট
5	অ্যামালথিয়া (Amalthea)	1892	150 কি. মি.	1,80,900 কি. মি.	11 ঘণ্টা 57 মিনিট
1	আইও (Io)	1610	3,640 কি. মি.	4,21,000 কি. মি.	1 দিন 18 ঘণ্টা 27 মিনিট
2	ইউরোপা (Europa)	1610	3050 কি. মি	6,71,000 কি. মি.	3 দিন 13 ঘণ্টা 14 মিনিট
3	গ্যানিমীড (Ganymede)	1610	5,220 কি. মি.	10,70,400 কি. মি.	7 দিন 3 ঘণ্টা 43 মিনিট
4	ক্যালিস্টো (Callisto)	1610	4190 কি. মি.	18,82,600 কি. মি.	16 দিন 16 ঘণ্টা 32 মিনিট
13	লেডা (Leda)	1974	—	1,11,15,000 কি. মি.	240 দিন
6	হিমালিয়া (Himalia)	1904	100 কি. মি.	1,14,77,500 কি. মি.	250 দিন 13 ঘণ্টা 35 মি.
10	লিসিথিয়া (Lysithea)	1938	20 কি. মি.	1,17,20,200 কি. মি.	259 দিন 5 ঘণ্টা 15 মিনিট
7	এলারা (Elara)	1905	30 কি. মি.	1,17,36,700 কি. মি	259 দিন 15 ঘণ্টা 40 মিনিট
12	আনাঙ্কে (Ananke)	1951	20 কি. মি.	2,12,43,000 কি. মি.	631 দিন
11	কার্মে (Carme)	1938	20 কি. মি.	2,25,89 000 কি. মি.	692 দিন
8	প্যাসিফি (Pasiphae)	1908	20 কি. মি.	2,34,87,000 কি. মি.	744 দিন
9	সিনোপে (Sinope)	1914	20 কি. মি.	2,36,36,000 কি. মি.	758 দিন

*সংখ্যাগুলি দেওয়া হয়েছে যেমন যেমন উপগ্রহগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে সেই ক্রমানুসারে। যেমন, প্রথম যে চারটি উপগ্রহের সন্ধান 1610 সালে গ্যালিলিও পেয়েছিলেন তাদের সংখ্যা যথাক্রমে 1,2,3 এবং 4। 1979 সালে আবিষ্কৃত সবশেষ উপগ্রহের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে 14।

শনির উপগ্রহ

উপগ্রহ	ব্যাস	শনি থেকে দূরত্ব	আবিষ্কারের তারিখ
15	80 কি. মি.	1,36,000 কি. মি.	1980
16	50 কি. মি.	1,38,200 কি. মি.	1981
14	30 কি. মি.	1,39,400 কি. মি.	1980
13	220 কি. মি.	1,41,700 কি. মি.	1980
11	120 কি. মি.	1,51,400 কি. মি.	1980
12	180 কি. মি.	1,51,400 কি. মি.	1980
য়্যানুস (Janus)	300 কি. মি.	1,60,000 কি. মি.	1967
মিমাস (Mimas)	500 কি. মি.	1,85,500 কি. মি.	1789
এনসেলাডাস (Enceladus)	600 কি. মি.	2,38,000 কি. মি.	1789
টেথিস (Tethys)	1040 কি. মি.	2,94,700 কি. মি.	1684
দিওন (Dione)	1120 কি. মি.	3,78,000 কি. মি.	1684
17	80 কি. মি.	3,78,000 কি. মি.	1981
রিয়া (Rhea)	1530 কি. মি.	5,28,000 কি. মি.	1672
টাইটান (Titan)	5117 কি. মি.	12,23,000 কি.মি.	1655
হাইপারিয়ান (Hyperion)	225 কি. মি	14,84,000 কি.মি.	1848
আয়াপিটাস (Iapetus)	1440 কি. মি.	35,63,000 কি. মি.	1671
ফিবি (Phoebe)	240 কি মি.	1,29,60,000 কি.মি.	1898

ভুল-সংশোধন ঃ

পৃঃ ৪-এ দেওয়া ক্যাপশন বই এর প্রথম ছবির। পৃঃ ২৮-এর ক্যাপশন পৃঃ ৩০-এ দেওয়া ছবির সঙ্গে পড়তে হবে। পৃঃ ৩০-এর ক্যাপশন পড়তে হবে পৃঃ ২৮-এর ছবির সঙ্গে।